সবুজ ভেলভেট

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

http://Doridro.com

শারমীন এমনভাবে স্টেশনের ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে যে, তাকে দেখে মনে হতে পারে সে বুঝি নিয়মিতভাবে এই ট্রেনে যাতায়াত করে। ভিড়ের ধাক্কায় মোহসিন সাহেব একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন; লম্বা পা ফেলে শারমীনের কাছে এসে বললেন, "ম্যাডাম!"

শারমীন ট্রেনের বগির নম্বর দেখতে দেখতে বলল, "বলেন।"

"ওয়ান লাস্ট টাইম।"

শারমীন হি হি করে হেসে উঠে বলল, "আপনি অন্তত পঞ্চাশবার বলেছেন ওয়ান লাস্ট টাইম! বলা উচিত ছিল ফিফটিয়েথ লাস্ট টাইম।"

মোহসিন সাহেব টাইয়ের নটটা একটু ঢিলে করে বললেন, "আপনি ঠাট্টা করেন আর যা-ই করেন ম্যাডাম, আমি এই ওয়ান লাস্ট টাইম বলছি আপনি প্লেনে চলেন। আপনার কথা বলে ফোন করে দিলেই প্লেন আটকে রাখবে। আমি স্টেশন ম্যানেজারকেও চিনি।"

শারমীন ঘুরে মোহসিন সাহেবের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, "আমি আসলে ট্রেনেই যেতে চাই।"

মোহসিন সাহেব ইংরেজিতে বললেন, "বাংলাদেশের ট্রেনের কী অবস্থা সে সম্পর্কে আপনার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।"

"সেই জন্যই তো যেতে চাইছি। শেষবার যখন ট্রেনে উঠেছি তখন আমি ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি।"

"এই ট্রেনে একটা এসি কম্পার্টমেন্ট ছিল, যদি সেটাতেও যেতেন একটা কথা ছিল, অপেন চেয়ারে বসে যাবেন আপনি— চিন্তাও করতে পারবেন না আপনার কী রকম কষ্ট হবে।"

শারমীন হাসি হাসি মুখ করে বলল, "আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না আমি কী পরিমাণ কষ্ট করতে পারি। নাইরোবিতে একবার ট্রেনে উঠেছিলাম, সেই গল্প শুনলে আপনি হার্টফেল করে ফেলবেন।"

"নাইরোবির দায়িত্ব তো আমার ছিল না ম্যাডাম, এখানকার দায়িত্ব আমার।" মোহসিন সাহেব হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, "আপনাকে ট্রেনে তুলে আমি যখন অফিসে যাব, ঢাকা থেকে বস যখন ফোন করে জিজ্ঞেস করবে আপনি কোথায়— আর আমি যখন বলব আপনি ট্রেনে, সেই মুহূর্তে আমাকে চাকরি থেকে ফায়ার করে দেবে। খোদার কিরে কেটে বলছি।"

শারমীন খিলখিল করে হেসে বলল, "এর পরের দায়িত্ব আমার। আপনাকে ফায়ার করার পর প্রমোশন দিয়ে আমি ঢাকায় নিয়ে আসব। আপনি যদি চান জেনেভাতে না হয় নিউইয়র্ক পোস্টিং দিয়ে দেব। খোদার কিরে কেটে বলছি।"

মোহসিন সাহেব কেমন যেন অসহায় অনুভব করেন, স্টেশনের এরকম ভিড়, গরম, ধাক্কাধাক্কিতে তার অভ্যাস নেই; এর মধ্যেই ঘামে শরীর ভিজে গেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে কিন্তু শারমীন নির্বিকার। ট্রেনের বগিটা খুঁজে বের করে বলল, "এই যে 'ঠ' বগি। ঠাট্টার 'ঠ'। আপনি শিওর তো জানালার সিট দিয়েছে? জানালা না হলে আমি কিন্তু যাব না।"

মোহসিন সাহেব জোর করে একটু হাসার ভঙ্গি করে বললেন, "আমি আগে জানলে মেক শিওর করতাম যেন এটা কিছুতেই জানালার সিট না হয়।"

শারমীন মোহসিন সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "নাও ইট ইজ টু লেট।"

মোহসিন সাহেব একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন, এতক্ষণে তিনি মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে, শারমীন সিদ্দিকা নামে এই মহিলাটি, যে মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে ইউনাইটেড নেশন্সের এত উঁচু পদে উঠে গেছে যে কফি আনানের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে, যে বাংলাদেশে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হোম মিনিস্ট্রি আলাদাভাবে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে— সে সত্যি সত্যি এই ট্রেনে যাবে। এই মেয়েটি খানিকটা খ্যাপা ধরনের, কে জানে জীবনে খুব বড় কিছু করতে হলে হয়তো একটু খ্যাপা হতে হয়। সারা জীবন খুব হিসাব করে চলেছেন বলে হয়তো তিনি বড় কিছু করতে পারেন নি, আর এই মেয়েটি এত অল্প বয়সে ওপরে উঠে গেছে।

মোহসিন সাহেব ঘড়ি দেখলেন। যদি ট্রেনটা ঠিক সময়ে ছাড়ে তাহলে তাদের হাতে এখন পনেরো মিনিটের মতো সময়। শারমীন যে প্লেনে না উঠে ট্রেনে রওনা দিয়েছে সেটা বুঝতে বুঝতে সময় লাগবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট, খোঁজাখুঁজি করতে করতে আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ততক্ষণে ট্রেন ঢাকার দিকে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। মোহসিন সাহেব শারমীনকে বললেন, "আপনি যেটা চাইছেন, সেটা কখনোই হবে না। আপনি নিরিবিলি যেতে পারবেন না। ট্রেনে লোকজন আপনাকে চিনে ফেলবে।"

"মোটেও চিনবে না। আমি তো আর ফিল্ম অ্যাকট্রেস না, আমাকে কেমন করে চিনবে?"

"আপনি বাংলাদেশে আসার পর প্রত্যেক দিন সব ন্যাশনাল পত্রিকায় আপনার ছবি ছাপা হয়েছে, টেলিভিশনে দেখিয়েছে। আজকেও সব পত্রিকায় প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে আপনার ছবি বের হয়েছে।"

শারমীন খিলখিল করে হেসে বলল, "সেই ছবি দেখে আমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারি না আর পাবলিক আমাকে চিনবে? কী একটা বাজে ছবি দিয়েছে দেখেছেন? আই অ্যাম মাচ বেটার লুকিং দেন দ্যাট!"

"সেটা সত্যি।" মোহসিন সাহেব বললেন, "আপনাকে দেখলে এখনো ইউনিভার্সিটির ছাত্রী মনে হয়, আর আপনি কোথায় উঠে গেছেন, সর্বনাশ!"

শারমীন ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে মোহসিন সাহেব, আমি আসি তাহলে।"

মোহসিন সাহেব একটা নিঃশ্বাস ফেলে হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন, "ঠিক আছে। আপনি সত্যিই যদি এভাবে যেতে চান তাহলে অই উইশ ইউ এ হ্যাপি জার্নি।"

শারমীন বলল, "থ্যাংক ইউ। দ্যাটস দ্য স্পিরিট।"

"আপনাকে কয়েকটা উপদেশ দিয়ে দিই। নো ম্যাটার হোয়াট রাস্তায় কিছু খাবেন না। ব্যাগে পানির বোতল দিয়েছি, খিদে পেলে সেই পানি খাবেন, নথিং এলস।"

"ঠিক আছে।"

"আপনার ব্যাগটা আপনার কাছে কত জরুরি আমি জানি না। যদি জরুরি হয় ব্যাগটা চোখে চোখে রাখবেন, তা না হলে কিন্তু ম্যাজিকের মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

"বেশ।"

"বিশ্বাস করেন আর না-ই করেন, এই দেশে এনাফ ম্যানিয়াক আছে যারা চলন্ত ট্রেনে ঢিল মেরে আনন্দ পায়। আমি পার্সোনালি চারটা এ রকম কেস জানি, একজন মারা গেছে, একজনের চোখ নষ্ট হয়েছে আর দুজন পিরিয়ডিক্যালি উন্ডেড।"

শারমীন ভ্রু কুঁচকে বলল, "কেন আপনি শুধু শুধু আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন? আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি এই দেশের মেয়ে, আমার বাবা

রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন অ্যান্ড আই হ্যাভ দ্য ফন্ডেস্ট মেমোরি অ্যাবাউট ট্রেন। আপনি যতই চেষ্টা করেন আপনি আমাকে ভয় দেখাতে পারবেন না।"

"আই অ্যাম সরি। আসলে আপনাকে ভয় দেখানো আমার ইচ্ছে ছিল না, শুধু একটু সাবধান করে দিচ্ছিলাম।"

"থ্যাংকস।" শারমীন হাসি হাসি মুখে বলল, "আমিও আপনাকে সাবধান করে দিই, সাবধানে ফেরত যাবেন। কাউকে বলবেন না যে আমি ট্রেনে। কেউ আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবেন, আপনি কিছু জানেন না। চাপাচাপি করলে বলবেন, একটা গাড়ি ভাড়া করে সম্ভবত বাই রোডে ঢাকা রওনা দিয়েছি।"

মোহসিন সাহেব হাসার চেষ্টা করে বললেন, "আপনি নিশ্চিত করতে চান যে শুধু যেন চাকরিটা না যায়, মরে গিয়ে যেন দোজখেও যাই!"

শারমীন শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "আপনার চাকরি গেলে আমি মনে হয় সেটা ম্যানেজ করে দিতে পারব। কিন্তু দোজখ থেকে মনে হয় না আপনাকে উদ্ধার করতে পারব। ইফ ইট ইজ অ্যানি কনসোলেশন— আই উইল বি দেয়ার উইথ ইউ!"

মোহসিন সাহেব বললেন, "আর দেরি করা ঠিক না। উঠে পড়েন।"

"আমি উঠছি। আপনি যান।"

"আপনাকে বসিয়ে দিয়ে যাই।"

"না, আপনাকে বসাতে হবে না। আমি একা গিয়ে বসে যাচ্ছি।"

"আপনি আগে গিয়ে আপনার সিটে বসুন— লেট মি মেক শিওর আপনার সিটে শুধু আপনি একাই আছেন, আপনাকে কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে হচ্ছে না এবং আপনার পাশে কোনো হার্ডকোর ক্রিমিনাল বসছে না।"

শারমীন ব্যাগ হাতে নিয়ে ট্রেনে ঢুকে গেল। মোহসিন সাহেব জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলেন শারমীন নিজের সিটে গিয়ে বসেছে। জানালার কাছে প্লাটফর্মের দিকে সিট, জানালা দিয়ে মাথা বের করে বলল, "এখন আপনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন?"

"হ্যাঁ, কিছুটা।" মোহসিন সাহেব জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে ট্রেনের সিটগুলো দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ম্যাডাম, আপনি স্বীকার করতে চাইছেন না কিন্তু আমি জানি আপনার খুব কষ্ট হবে।"

শারমীন হাসি হাসি মুখ করে বলল, "আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন যে, হয়তো এটাই আমি চাই?"

"চাইলে ভালো।"

"শুধু দোয়া করেন যেন আমার পাশে কোনো স্মোকার না বসে। আই হেট স্মোকিং।"

"দোয়া করে লাভ নেই—" মোহসিন সাহেব বললেন, "আপনার পাশে যে বসবে সে যদি স্মোকার না-ও হয়, শুধু আপনাকে ইমপ্রেস করার জন্য সিগারেট ধরিয়ে ফেলবে।"

"কেন?"

"কারণ এ দেশে সিগারেট খাওয়া হচ্ছে ভদ্রতা। আপনি একজন ভদ্রমহিলা যাচ্ছেন, আপনার পাশে বসে যদি ভদ্রতা করে দুই-চারটা সিগারেট না খাওয়া হয় তাহলে কেমন করে হবে?"

মোহসিন সাহেবের কথা বলার ভঙ্গি দেখে শারমীন হেসে ফেলল। বলল, "বাংলাদেশের এই একটা জিনিসে আমি এখনো অভ্যস্ত হতে পারি নি। এভরিওয়ান ইজ স্মোকিং।" তারপর সুর পাল্টে বলল, "ঠিক আছে মোহসিন সাহেব, এবারে তাহলে গুডবাই বলা যাক। থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং।"

মোহসিন সাহেব কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ করে তার এই খ্যাপাটে ধরনের মেয়েটিকে বিদায় দিতে কষ্ট হতে লাগল। দুই মাস আগে যখন হেড অফিস থেকে চিঠি এসেছিল, তার ভেতরে কত রকম দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে নিজের মেয়েকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ইউনাইটেড নেশন্সের কত বড় একজন কর্মকর্তা অথচ তার মনে হতে লাগল, তিনি মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে পারবেন, "ভালো থেকো মা।"

তিনি অবশ্য কিছু বললেন না, ট্রেন ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত ট্রেনের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ট্রেনটা ছেড়ে দেওয়ার পরও শারমীনের পাশের সিটে কেউ এসে বসল না। এই ট্রেনে খুব ভিড় হয়— কাজেই এই সিটের টিকেট বিক্রি হয় নি বলে ফাঁকা রয়ে গেছে সে রকম কোনো সম্ভাবনা নেই। প্যাসেঞ্জার মানুষটি আশপাশে কোথাও নিশ্চয়ই আছে; সময়মতো এসে বসে যাবে। কাজেই শারমীন ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। এই মুহূর্তে ট্রেনটি শহরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে; আশপাশে ঘিঞ্জি বাড়িঘর, ছোটখাট দোকানপাট, রাস্তাঘাট, মানুষজনের ভিড়। যে-কোনো হিসেবেই দৃশ্যগুলো কুশ্রী। কিন্তু শারমীন এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। এটিই তার দেশ। এভাবে এত কাছ থেকে এই দেশ কত দিন সে দেখে নি। একটু পরেই ট্রেন শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে চলে আসবে। সেখানকার দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত, বাড়িঘর, গাছপালা, নদী দেখার জন্য শারমীন বুভুক্ষুর মতো বসে রইল। কত দিন সে এভাবে ট্রেনে যায় নি, ট্রেন থেকে কিছু দেখে নি।

হঠাৎ করে তার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হলো। পাশেই দুজন মানুষ চাপাস্বরে তর্ক করছে। শারমীন শুনতে পেল একজন বলল, "না, আমার স্ত্রী ওই সিটে যাবে না। আমার সঙ্গে থাকবে।"

দ্বিতীয় মানুষটি বলল, "অসুবিধার কী আছে? একজন মেয়েলোকের কাছে আপনার স্ত্রী বসতে পারে না?"

"আমরা যে সিটের টিকেট কিনেছি, সেই সিটে যাব।"

শারমীন হঠাৎ করে বুঝে গেল কী হচ্ছে। তার পাশে প্যাসেঞ্জার মানুষটি এখানে বসতে চাইছে না, মহিলা প্যাসেঞ্জারদের কাউকে রাজি করিয়ে এখানে আনার চেষ্টা করছে। শারমীন এ পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক দেশের প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসে এসেছে অথচ এই দেশের একজন মানুষ কিনা তার পাশে বসতে চাইছে না— ব্যাপারটা নিয়ে তার এক ধরনের কৌতুক অনুভব করা

উচিত ছিল। কিন্তু শারমীন অনুভব করল, সে অপমানের অস্পষ্ট একটা খোঁচা অনুভব করছে। শারমীন চোখের কোনা দিয়ে মানুষটাকে দেখার চেষ্টা করল। তার দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মানুষটা টুপি-দাড়ি এবং আলখাল্লা পরা মৌলবি সাহেব নয়, শার্ট-প্যান্ট পরা কম বয়সী একজন মানুষ। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় শারমীন তা নয় কিন্তু তার চেহারায় যে এক ধরনের আকর্ষণ আছে সেটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আজকে অবশ্য ইচ্ছে করে একটা হালকা নীল রঙের সুতি শাড়ি পরে এসেছে, পায়ে ফ্ল্যাট স্যান্ডেল, চুলগুলোতে ঢিলেঢালা একটা বেণি, ঠোঁটে-মুখে কোনো প্রসাধন নেই— দেখে তাকে আলাদা করে চেনার কোনো উপায় নেই। তাই বলে তার পাশে কমবয়সী একজন মানুষ বসতে চাইবে না, এটা কেমন করে হয়!

শারমীন চোখের কোনা দিয়ে দেখল মানুষটি পেছনে আরো একজনকে রাজি করাতে না পেরে শেষপর্যন্ত খুব অনিচ্ছার সঙ্গে তার পাশে এসে বসল। মানুষটার চেহারাটা ভালো করে দেখার খুব কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু যে পাশে বসে আছে তার চেহারা ভালো করে দেখতে হলে সরাসরি তার দিকে তাকাতে হয়। শারমীন এই মুহূর্তে সেটা করতে একটু অস্বস্তি অনুভব করল। তবে চোখের কোনা দিয়ে মানুষটার জামা-কাপড়গুলো লক্ষ করল— গাঢ় সবুজ রঙের প্যান্ট, প্যান্টের কাপড়টা ভেলভেট ধরনের— হলিউডের সিনেমায় বেশ্যালয়ের দালালরা এই ধরনের কাপড়ের প্যান্ট পরে! আমাদের দেশে শুধু দরিদ্র মানুষরা নিশ্চয়ই এই ধরনের উৎকট রঙের কাপড় পরে। শার্টটা শরীরের তুলনায় লম্বা— আজকাল দেশে সবাই রেডিমেড কাপড় পরে। শরীরের সাইজ একটু ছোট কিংবা বড় হলে ঠিক মাপের কাপড় পাওয়া বেশ মুশকিল হয়। সাধারণ মানুষ তখন একটু ছোট কাপড় না কিনে একটু বড় কাপড় কিনে ফেলে বলে মনে হয়।

শারমীন সোজাসুজি না তাকালেও চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে বুঝতে পারল মানুষটা খুব অস্বস্তি নিয়ে বসেছে। বসার ভঙ্গি অত্যন্ত আড়ষ্ট এবং পুরো শরীরটাকে বাইরের দিকে চেপে রেখেছে যেন কোনোভাবেই শারমীনের শরীরের সঙ্গে তার শরীর লেগে না যায়। হাত-পা নেড়ে শারমীন হঠাৎ করে মানুষটার শরীর স্পর্শ করে ফেললে সে কী করবে তার খুব দেখার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু শারমীন চেষ্টা করে তার কৌতূহলটাকে দমিয়ে রাখল। তার পাশে বসা নিয়ে মানুষটা যে কাজটি করেছে সেটা নিয়ে নিজের ভেতরে খানিকটা ছেলেমানুষি চাপা রাগ জমা হয়ে আছে; তা না হলে সে নিজে থেকে এক-দুইটা কথা বলে মানুষটাকে একটু সহজ করার চেষ্টা করত। কিন্তু এখন তার আর ইচ্ছে করল

না। শারমীন কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল; তারপর খবরের কাগজগুলো খুলে বসল। মোহসিন সাহেব যাওয়ার আগে সবগুলো পত্রিকা কিনে দিয়ে গেছেন। প্রায় সব পত্রিকাতেই তার আর প্রাইম মিনিস্টারের ছবি ছাপা হয়েছে। ছবি তোলার সময় সে নিশ্চয়ই হেসে ফেলেছিল। তার সবগুলো দাঁত বের হয়ে আছে— দেখে মনে হচ্ছে সে কিছু একটা নিয়ে মশকরা করছে। যে মানুষ প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে মশকরা করে তাকে কি কেউ সিরিয়াসলি নেবে? শারমীন পত্রিকাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে তার পাশে রাখতে থাকে।

পাশে বসা মানুষটি উশখুশ করছে, মনে হয় পত্রিকা পড়তে চাইছে কিন্তু চাওয়ার সাহস পাচ্ছে না। মানুষটা শেষপর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে শারমীনের পাশে রাখা একটা বাংলা পত্রিকা টেনে নেয়— অন্য একজনের পত্রিকা পড়ার জন্য নিতে হলে যে একটা অনুমতি নেওয়ার ব্যাপার আছে মানুষটা সেটা জানে না। মানুষটা পত্রিকা খুলে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করে। শারমীন দেখল প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে তার ছবিটা মানুষটা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। শারমীন যে তার পাশেই বসে আছে জানলে লোকটা কী করত কে জানে!

শারমীন শুনেছিল, আন্তঃনগর এই ট্রেনগুলো নাকি খুব ছিমছাম এবং নির্ঝঞ্ঝাট। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে রাজ্যের মানুষ বিক্রি করার জন্য তাদের সব রকম জিনিসপত্র নিয়ে ট্রেনে উঠে গেছে। প্রথমে দুজন বাচ্চা ছেলে খবরের কাগজ নিয়ে এলো, মোহসিন সাহেব সবগুলো কিনে দিয়ে না থাকলে সে নিশ্চয়ই বাচ্চাগুলোর কাছ থেকে এক-দুইটা কাগজ কিনত। এরপর একজন ঝালমুড়িওয়ালা এলো, ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা খুব উৎসাহ দেখাল না— সবাই নিশ্চয়ই খেয়ে-দেয়ে ট্রেনে উঠেছে, কারো এখনো সেরকম খিদে পায় নি। তারপর একজন কিছু রুমাল বিক্রি করতে চেষ্টা করল। শারমীনের পাশে বসে থাকা মানুষটি রুমালগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল, দরদাম করল কিন্তু শেষপর্যন্ত কিনল না। 'মিনারেল', 'মিনারেল' বলে একজন বোতলের পানি বিক্রি করার চেষ্টা করল। তারপর একজন একটা চাঁদার বই নিয়ে মসজিদের জন্য সাহায্য আদায় করার চেষ্টা করতে লাগল। পরকালের জন্য নানারকম লোভ দেখানোর পরও কোনো মানুষকে নরম হতে দেখা গেল না। এর পরেই খোঁড়া একটা মানুষ লাঠিতে ভর করে ভিক্ষা করতে করতে আসে। তুলনামূলকভাবে এই মানুষটি অনেকের হৃদয় দ্রবীভূত করে ফেলল। তবে মানুষটির জন্য মায়াবশত না তার নাকি গলার গানের কারণে বিরক্ত হয়ে, শারমীন সে বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারল না। খোঁড়া মানুষটি শারমীনদের কাছাকাছি এসেও নাকি গলায় ঘ্যানঘ্যান করে ভিক্ষে চাইতে থাকে; পাশে বসে থাকা মানুষটি তখন তাকে একটা ধমক দেয়, "ভাগ ব্যাটা ভাগ, লেংড়া কোথাকার!"

একজন খোঁড়া মানুষকে যে লেংড়া বলে গালাগাল করা যায়, শারমীন সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না। তবে খোঁড়া মানুষটি কিছুই মনে করল না বরং মনে হলো তার শারীরিক অক্ষমতাটা যে এই মানুষটির চোখে পড়েছে তাতেই সে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। বলল, "আমি অচল মানুষ, লুলা মানুষ, আল্লাহর ওয়াস্তে আমারে চারটা ভিক্ষা দেন।"

"ডিস্টার্ব দিবি না, যা— যা।"

খোঁড়া মানুষটি দীর্ঘদিন থেকে ভিক্ষা-ব্যবসা করছে, মানুষের গলার স্বর, অঙ্গভঙ্গি, সামাজিক অবস্থা দেখে সে মোটামুটি বুঝে ফেলতে পারে কে ভিক্ষা দেয় আর কে দেয় না। এখানেও সে একটা সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে আরো কিছুক্ষণ সময় ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। বলল, "স্যার গরিবরে একটু সাহায্য করেন, কাজ করে খাওয়ার শক্তি নাই, আমি লুলা মানুষ, অচল মানুষ।"

"লুলা হইলি কীভাবে?"

"জন্ম থেকে অচল স্যার। ঠ্যাংগে শক্তি নাই।"

শারমীন দেখল পাশে বসা মানুষটি খুব বিরক্তির ভঙ্গি করে পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বের করল, সেখানে অল্প কয়টা নোট, তার থেকে একটা জীর্ণ দশ টাকার নোট বের করে বলল, "নয় টাকা দে।"

শারমীন ভিক্ষে দেওয়ার অনেক রকম পদ্ধতি দেখেছে কিন্তু ভিক্ষুকের কাছ থেকে যে টাকা ভাঙিয়ে নেওয়া যায় সেটা সে আগে কখনোই দেখে নি। কিন্তু পদ্ধতিটি নিশ্চয়ই প্রচলিত। কারণ খোঁড়া ভিক্ষুকটি তার কোমরের গোঁজ থেকে পুরনো ময়লা টাকার বান্ডিল বের করে সেখান থেকে ভাঙতি দিয়ে দশ টাকার নোটটি পকেটস্থ করে প্রথমে পাশে বসা মানুষটির দীর্ঘ সুখী সম্পদশালী মানুষের একটি জীবন কামনা করে আবার গানের সুরে তার হতভাগ্য জীবন নিয়ে বক্তব্য দিতে দিতে লাঠিতে ভর করে এগিয়ে যেতে লাগল।

গাঢ় সবুজ রঙের প্রায় ভেলভেট জাতীয় কাপড়ে তৈরি প্যান্ট পরা মানুষটি খুচরা টাকাগুলো দ্বিতীয়বার গুনে পকেটে রেখে খানিকটা স্বগতোক্তি এবং খানিকটা শারমীনকে শুনিয়ে বলল, "এই ফকিরের জ্বালায় শালার ট্রেনজার্নি করা যায় না।"

একেবারে চুপ করে থাকলে কথাটাকে উপেক্ষা করা হয়, সেটি এক ধরনের অভদ্রতা। কাজেই শারমীন খুব সাবধানে অল্প একটু মাথা নাড়ল। পাশে বসা মানুষটি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার এই অতি সূক্ষ্ম সুযোগটি ছাড়ল না। শারমীনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ট্রেনের অ্যাটেনডেন্টদের সঙ্গে ফকিরদের ব্যবস্থা থাকে। শালারা টাকা খায়।"

শারমীন ভদ্রতা করে বলল, "তাই নাকি ?"

মানুষটা এবারে উৎসাহ পেয়ে গেল। বলল, "কী বলেন আপা, সব শালা চুর।" কথায় জোর দেওয়ার কারণে চোর শব্দটিকে সে 'চুর' বলে উচ্চারণ করে ফেলে।

পৃথিবীর সব মানুষকে শালা বলা যায় কি না, বলা গেলেও একজন অপরিচিতা ভদ্রমহিলার সামনে এ ধরনের শব্দচয়ন যথার্থ কি না কিংবা সবাই যদি চোর হয় তাহলে নিজের অবস্থানটা কোথায়— এই ধরনের নানা প্রশ্ন শারমীনের মাথায় উঁকি দিয়ে গেলেও সে কোনো শব্দ করল না, শুধু মুখে একটা মৃদু হাসি দিয়ে আলোচনা আপাতত স্থগিত করার চেষ্টা করল। এতক্ষণ মানুষটার দিকে সরাসরি তাকানো সম্ভব হয় নি, এবারে তাকে দেখার সুযোগ পেয়েছে। মানুষটার গায়ের রঙ শ্যামলা, গাল দুটি ভাঙা, অত্যন্ত যত্ন এবং পরিচর্যা করে রাখা সরু গোঁফ, মাথার চুল সামনে পাতলা হয়ে আসছে। বয়স সম্ভবত ত্রিশের কাছাকাছি— আরো কমও হতে পারে। এই দেশে কষ্টকর জীবনে মানুষ অনেক তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়।

মানুষটা অবশ্য আলোচনা স্থগিত করার কোনো লক্ষণ দেখাল না। মুখে বেশ বিস্তৃত একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "আপার পত্রিকা পড়তে খুব ভালো লাগে ? সাতটা পত্রিকা কিনেছেন! সাতটা পত্রিকা গিয়ে ধরেন হলো সাত সাতে উনপঞ্চাশ টাকা।"

শারমীন একটু অস্বস্তি অনুভব করে, এই দেশে শুধু পত্রিকা পড়ার জন্য এত টাকা খরচ করলে সেটি যে মানুষের চোখে পড়তে পারে, সে আগে খেয়াল করে নি। খানিকটা কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "আমি কিনি নি। আমাকে কিনে দিয়েছে।"

"আপনার বাবা কিনে দিয়েছেন ?" মানুষটা মুখ সুচালো করে বলল, "খুব খানদানি চেহারা।"

সে কী বলছে বুঝতে শারমীনের এক মুহূর্ত বেশি সময় লাগল— মোহসিন সাহেবকে সে তার বাবা ধরে নিয়েছে। সে যে ট্রেনে এসেছে, তাকে আরেকজন তুলে দিয়েছে, পুরো ব্যাপারটাই তাহলে এই মানুষটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। শারমীন মাথা নেড়ে বলল, "না উনি আমার বাবা না। অফিসের মানুষ।"

"ও! অফিসের মানুষ!" মানুষটি তথ্যটাকে খুব মূল্যবান একটা তথ্য হিসেবে বিবেচনা করে মাথা নাড়তে থাকে। তারপর বলে, "আপা কি কলেজের মাস্টার ?"

শারমীন ফিক করে হেসে ফেলল, কলেজের মহিলা টিচারদের একটি বিশেষ চেহারা থাকে, তার চেহারা নিশ্চয়ই সেই টিচারদের মতো। বলল, "না, আমি কলেজের মাস্টার না।"

শারমীন যে ধরনের মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করে, সেখানে কেউ কখনো কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কৌতূহল দেখায় না, কাউকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা সেখানে অনেকটা কাপড় খুলে দেখার মতো অশালীন একটা কাজ। কিন্তু এই মানুষটি সেটি জানে না। সে জিজ্ঞেস করে, "তাহলে আপা কি চাকরি করেন ?"

শারমীন মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ, চাকরি করি।"

"কিসে চাকরি করেন ?"

শারমীনের হঠাৎ মনে হলো সে যদি এখন খবরের কাগজে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে তার ছবিটা দেখিয়ে বলে, "এই যে এখানে লেখা আছে, পড়ে দেখেন", তাহলে লোকটা কী করবে ? এটা করতে তার কেমন জানি একটা ছেলেমানুষি ইচ্ছে মনে জাগল, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে নিজেকে নিবৃত্ত করল। বলল, "ইউনাইটেড নেশন্সে চাকরি করি।"

ইউনাইটেড নেশন্স জিনিসটা কী মানুষটা জানে না। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "এনজিও ?"

শারমীন চেষ্টা করে হাসি আটকে রেখে বলল, "বলতে পারেন।"

মানুষটা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপা, এই একটা ব্যাপার নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন।"

"কী প্রশ্ন ?"

"এই যে এনজিওগুলো গ্রামের মেয়েছেলেকে ঘর থেকে বের করে ফেলছে, কাজটা কি ভালো হচ্ছে ?"

শারমীন এই দেশের মেয়েদের অবস্থার পরিসংখ্যানগুলো খুব ভালো করে জানে। মেয়েদের পড়াশোনা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটা খুব বড় প্রজেক্টের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্যে সে এই দেশে এসেছে। কিন্তু ট্রেনে পাশে বসে থাকা মানুষের এই চাছাছোলা প্রশ্নটির উত্তর কী হতে পারে চট করে বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "ঘর থেকে বের করে ফেলছে মানে ?"

"গ্রামে গেলে বুঝতে পারবেন আপা। আগের গ্রাম আর নাই। মেয়েলোকেরা সমিতি করে, স্বামীর সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করে। সবকিছুর তো একটা জায়গা আছে। এখন যদি মনে করেন সব মেয়েলোক রান্নাঘর ছেড়ে বের হয়ে আসে, কাজটা কি ভালো হবে ?"

শারমীন ভালো করে মানুষটার দিকে তাকাল, কী গভীরভাবেই না মানুষটা বিশ্বাস করে যে, রান্নাবান্না করাই হচ্ছে মেয়েলোকের জীবন। শারমীন বেশ অবাক হলো যখন দেখল সে মানুষটার ওপর রেগে উঠছে না, বেশ হাসিমুখেই বলছে, "আমিও তো রান্নাঘর ছেড়ে বের হয়ে এসেছি!"

মানুষটা থতমত খেয়ে বলল, "আপনার কথা আলাদা।"

"কেন? আমার কথা আলাদা কেন?"

"আপনি পড়ালেখা জানা মানুষ।"

"অন্যরাও পড়াশোনা করবে।"

মানুষটা এমনভাবে শারমীনের দিকে তাকিয়ে রইল, যেন সে খুব একটা মজার কথা বলেছে। শারমীন বলল, "আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?"

"না, মানে..."

"আমার বাবা কী বলতেন জানেন?"

"কী বলতেন?"

"বলতেন যে, আমার যদি সব ছেলেমেয়েকে পড়ানোর পয়সা না থাকে তাহলে শুধু মেয়েদের পড়াব।"

শারমীন যেন খুব একটা হাসির কথা বলেছে, এরকম ভান করে মানুষটা দুলে দুলে হাসতে লাগল। শারমীন চোখ পাকিয়ে বলল, "কী হলো, আপনি হাসছেন কেন?"

"আপা আপনি অনেক মজা করে কথা বলেন।"

কথা বলার ভঙ্গির জন্য শারমীনকে সারা জীবনে অনেকে অনেকভাবে প্রশংসা করেছে কিন্তু এই প্রশংসাটি সম্পূর্ণ অন্যরকম। এর আগে কেউই তাকে বলে নি সে মজা করে কথা বলে। শারমীন রেগে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলে চুপ করে গেল।

মানুষটা ইতস্তত করে বলল, "আপা কি বেয়াদবি নিলেন?"

"না, বেয়াদবি নিই নি।"

"আমরা তো অশিক্ষিত মানুষ, কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলি বুঝি না।"

"আপনি পড়াশোনা করেনই নি?"

"মেট্রিক দিয়েছিলাম, আটকে গেছি।"

"কেমন করে আটকালেন?"

"গ্রামের স্কুল, পড়াশোনা হয় না। নকলের ওপর ভরসা করে সবাই ফেল হয়। সেই বছর খুব কড়াকড়ি।"

মানুষটি এরপর তার ছোট একটি 'ভুলের' জন্য কীভাবে হৃদয়হীন 'নিষ্ঠুর' একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কারণে তাকে 'এক্সপেল' হতে হলো সেটি সে বেশ গুছিয়ে বর্ণনা করল। মানুষটা সাদাসিধে ধরনের, তবে কথা বলতে পছন্দ করে এবং কিছু একটা বলার সময় প্রচুর অপ্রয়োজনীয় কথা বলে। মনোযোগ ধরে রাখা একটু কঠিন; তারপরও শারমীন পুরোটা মন দিয়ে শুনল। সত্যি কথা বলতে কী, পরীক্ষায় নকল করার পক্ষেও যে যুক্তি থাকতে পারে, সেটি শারমীন এই প্রথমবার এই মানুষটির কাছে জানতে পারল। মানুষটা নিজের কাহিনী শেষ করে শারমীনকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো আমাদের মতো না; অনেক লেখাপড়া করেছেন, তাই না আপা?"

"তা মোটামুটি করেছি।"

"দেখেই বুঝেছিলাম।" অনুমানটি সত্যি বের হওয়ায় আনন্দে মানুষটার চোখেমুখে একটা পরিতৃপ্তির ভাব দেখা গেল।

"দেখেই কি বোঝা যায় কে পড়াশোনা করেছে?"

মানুষটা মুখে অনাবশ্যক গাম্ভীর্য এনে বলল, "জি আপা বোঝা যায়। একজন মানুষ শিক্ষিত কি না, বড় ফ্যামিলির কি না আর বড় চাকরি করে কি না সেটা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। আপনাকে দেখেই আমি বুঝেছি আপনি খুব বড় চাকরি করেন আর খুব খানদানি ফ্যামিলির।"

শারমীনের মুখে একটা কৌতুকের ভাব চলে এলো। জিজ্ঞেস করল, "চেহারা দেখে কোন জিনিসটা বোঝা যায় না?"

মানুষটা সাথে সাথে উত্তর দিল, "একজন মানুষ ভালো না খারাপ সেটা বোঝা যায় না।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। অনেক খারাপ মানুষ আছে চেহারা খুব ভালো, সুন্দর করে কথা বলে। দেখে বুঝতেও পারবেন না স্বভাব খাটাশের মতো।"

শারমীন একটু অবাক হলো। ঘটনাক্রমে পাশে বসে পড়া এই সাধারণ মানুষটির মনে হচ্ছে জীবন সম্পর্কে বেশ নিজস্ব একটা ধারণা আছে। শারমীন জিজ্ঞেস করল, "তার মানে আমি মানুষটা ভালো না খারাপ সেটা আপনি আমার চেহারা দেখে বলতে পারবেন না?"

মানুষটা থতমত খেয়ে বোকার মতো হেসে ফেলে বলল, "আপা যে কী বলেন! আপনি খারাপ হবেন কেন ? আপনি এত শিক্ষিত খানদানি ফ্যামিলির মানুষ, এত বড় চাকরি করেন, আপনারা খারাপ হলে চলবে কেমন করে ?"

শারমীন কোনো কথা না বলে মাথা ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ট্রেনলাইনের দুপাশে বিস্তৃত ধানক্ষেত, কচি সবুজ রঙ দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মানুষটা ঠিক বুঝে বলেছে কি না সে নিশ্চিত নয়, কিন্তু একটা সত্যি কথা বলেছে। এত বড় তার দায়িত্ব, সে যদি খাঁটি না হয়, ভালো না হয়, ঠিক কাজটি না করে, তাহলে হাজার হাজার মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাবে। মানুষটা একটু উশখুশ করে বলল, "আপা, আপনি আসলেই তো বড় চাকরি করেন ?"

শারমীন মাথা ঘুরিয়ে ভেতরে তাকাল। বলল, "হ্যাঁ, করি।"

মানুষটা অনেকটা আপন মনে মাথা নাড়ল, নিজের কিছু হিসাব মিলে গেছে— এ রকমভাবে কিছু একটা চিন্তা করে বলল, "অনেক টাকা বেতন পান ?"

শারমীন কী বলবে বুঝতে পারল না। ইতস্তত করে বলল, "হ্যাঁ, বেশ ভালোই বেতন পাই। মোটামুটি দিন চলে যায়।"

মানুষটার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। বলল, "দেখেছেন, আমি বলেছিলাম না আপনি খানদানি ফ্যামিলির— এখন হাতেনাতে প্রমাণ হলো।"

শারমীন অবাক হয়ে বলল, "কীভাবে প্রমাণ হলো ?"

"এই যে আপনি কত টাকা বেতন পান সেটা বললেন না। আপনার জায়গায় যদি একটা ছোট ফ্যামিলির মানুষ হতো, বেতনের টাকাটা বলত। টাকার গরম দেখাত। বুঝেছেন আপা, ছোটলোকের হাতে যদি বেশি টাকা হয় অসহ্য হয়ে যায়।"

শারমীনের মনে হলো একবার লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, বেশি টাকা বলতে সে কী বোঝায়। শারমীনের বেতনটা কি বেশি ? ডলারে সে যে বেতন পায়, সেটাকে টাকায় পাল্টে নিলে যে সংখ্যাটি হবে, এই মানুষটা কি সেই সংখ্যাটি কখনো কল্পনা করতে পারবে ? মনে হয় না। শারমীন কিছু বলল না, ঠিক কী কারণ জানা নেই তার। কেন জানি নিজেকে হঠাৎ করে তার অপরাধী মনে হয় এবং সে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মানুষটা গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা ভাবতে ভাবতে জিজ্ঞেস করল, "আপা, আপনার চাকরিতে সুযোগ-সুবিধা কী রকম ?"

"ভালোই।"

"বাড়ি দেয় ?

শারমীনের চোখের সামনে ম্যানহাটানে তার বিশাল অ্যাপার্টমেন্টটার ছবি ভেসে উঠল। বলল, "দেয়।"

"গাড়ি ?"

ইউএনওর গাড়ি ছাড়াও নিউইয়র্কে তার নিজের একটা বিএমডব্লিউ আছে। সে বলল, "দেয়"।

মানুষটি বলল, "আলহামদুলিল্লাহ! চাকরি করলে এই রকম চাকরি করা দরকার।"

শারমীন মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কী করেন ?"

"আমরা অশিক্ষিত মানুষ, আমাদের চাকরি ছোট।"

"তবু শুনি।"

"বড় বাজারে আমার মালিকের কাপড়ের দোকান আছে, আমি দোকানের ম্যানেজার।"

"ও!" শারমিন আর কী বলবে বুঝতে পারল না। দু'জন চুপচাপ পাশাপাশি বসে রইল।

মানুষটা হঠাৎ এক সময় ছটফট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপা, বেয়াদবি নেবেন না। বিড়ি-সিগারেটের নেশা হয়ে গেছে। একটা সিগারেট খেয়ে আসি ?"

"যান।" মানুষটা তার পাশে বসে সিগারেট খাচ্ছে না— এই জন্যই শারমীন তার প্রতি একটা গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে।

শাহেদ খুব সিগারেট খেত। আজ হঠাৎ করে এত দিন পর এই চলন্ত ট্রেনে বসে শাহেদের কথা কেন মনে পড়ল কে জানে। শাহেদের সঙ্গে প্রথম যেদিন শারমীনের দেখা হয় সেই দিনটির কথাও শারমীনের স্পষ্ট মনে আছে। একটা নাটকের রিহার্সেলে শারমীনের বিপরীতে মূল চরিত্রে অভিনয় করছিল জাহিদ। কী কারণে যেন সেদিন আসতে পারে নি। কাউকে সেখানে দিয়ে রিহার্সেলটা শেষ করতে হবে— সবাই ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে, কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন কে একজন বলল, "এই শাহেদ, তুই যা না।"

শারমীন তখন মাথা ঘুরিয়ে শাহেদকে দেখেছিল, যে জিনিসটা প্রথমে চোখে পড়েছিল সেটা হচ্ছে তার খোঁচাখোঁচা দাড়ি! শাহেদকে নাটক করতে বলায় সে এত অবাক হয়েছিল যে, বলার মতো নয়। চোখ কপালে তুলে বলল, "আমি ?"

"হ্যাঁ। অসুবিধে কী আছে ? নাটকে তো অভিনয় করতে বলছে না, শুধু আজকের দিনটা গ্যাটিস দিয়ে যাবি!"

কী মনে করে এককথায় রাজি হয়ে স্টেজে উঠে এসেছিল শাহেদ। রিহার্সেল শেষে শাহেদ শারমীনকে জিজ্ঞেস করল, "কেমন করেছি আমি ?"

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে শারমীন জিজ্ঞেস করল, "কোন ডিপার্টমেন্টে পড়েন ?"

"বায়োকেমিস্ট্রি।"

"ভেরি গুড! ওই লাইনেই থাকবেন— নাটকে আসবেন না কখনো!"

শাহেদ হেসে ফেলে বলল, "এত খারাপ ?"

"হ্যাঁ।" শারমীন সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "মন খারাপ করবেন না, সবাই তো সবকিছুতে ভালো হয় না, আপনি নিশ্চয়ই বায়োকেমিস্ট্রিতে খুব ভালো।"

শারমীনের কথা শুনে হা হা করে হাসল শাহেদ।

তারপর কীভাবে কীভাবে জানি দুজনের ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। দুজনের মধ্যে কোথায় জানি এক ধরনের মিল ছিল, দুজনই একটু খ্যাপা ধরনের, জীবনের সবকিছু নিয়ে দুজন পরীক্ষা করতে পছন্দ করত, দুজনই সবকিছু নিয়ে ঝুঁকি নিত, জীবনের সবকিছু উপভোগ করার চেষ্টা করত। কাজেই দু'জন যখন একদিন বিয়ে করে ফেলল কেউ অবাক হয় নি। শাহেদ-শারমীন জুটি যেন ভবিতব্য অনেক হিসাব করে তৈরি করে রেখেছে। ইউনিভার্সিটিতে দুজন মাস ছয়েক চাকরি করে পিএইচডি করতে গেল হার্ভার্ডে। দুজন এক ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পাওয়াটাও ছিল কাকতালীয়। হার্ভার্ডের সেই জীবনটা খুব সুন্দর ছিল তাদের। গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টের অল্পকিছু টাকা দিয়ে দুজন টানাটানি করে চালাত, কিন্তু জীবনটা একেবারে পরিপূর্ণ ছিল তাদের। পড়াশোনার চাপ, গবেষণার চাপ তার মধ্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈচৈ-হুল্লোড় সব মিলিয়ে একেবারে অপূর্ব। তাদের একজন বন্ধু ছিল উড়িষ্যার, নাম অশোকা। খুব হাসিখুশি মেয়ে ছিল অশোকা— জীবনটাকে কিছুতেই সিরিয়াসলি নেবে না বলে ঠিক করে রেখেছিল। সে সত্যিই কখনো নেয় নি কিন্তু শাহেদ নিয়ে ফেলল। আর একদিন শারমীন অবাক হয়ে দেখল, দুজনের মধ্যে অনেক ব্যবধান। সেই ঘটনার কথা মনে করে শারমীন এত দিন পরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বাবার অসুখের খবর পেয়ে এক সামারের জন্য দেশে এসেছিল। সামার শেষে বাবাকে কবর দিয়ে হার্ভার্ডে ফিরে গিয়ে দেখে, কোথায় জানি সুর কেটে গেছে।

শাহেদ কিছু বলে নি, বলেছিল অশোকা। হাসিখুশি অশোকার কাছে পুরোটাই একটা খেলা কিন্তু শারমীন জীবনটাকে তো এ রকম ছেলেখেলার মতো নেয় না। সবকিছু শুনে একদিনও সে শাহেদের সঙ্গে ঝগড়া করে নি। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে একা একা বেশ কদিন ভেবেছে; তারপর একদিন শাহেদকে জিজ্ঞেস করেছে, "এটা সত্যি শাহেদ ?"

শাহেদ মাথা নিচু করে বলল, "সত্যি। কিন্তু..."

শাহেদ 'কিন্তু'টা ব্যাখ্যা করার অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু শারমীন শুনতে রাজি হয় নি। দুই মাসের মধ্যে তাদের ডিভোর্স হয়ে গেল। তাদের পড়াশোনায় কোনো ক্ষতি হয় নি, ঠিক সময়ে দুজনই পিএইচডি করে বের হয়ে গেছে। শাহেদ এখন ফ্লোরিডার একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। টেনিউর ট্রেক পজিশন খুব ভালো আছে। ব্রিটিশ একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ে আছে

দুজন। শারমীন গিয়েছে ইউনাইটেড নেশন্সে। ব্রাসেলস, জেনেভা, নাইরোবি হয়ে এখন নিউইয়র্ক। এত দ্রুত এত উঁচু একটা পদে উঠে গেছে যে, শারমীনের মাঝে-মধ্যে নিজেরও বিশ্বাস হয় না।

"আপা, একটা কলা খাবেন ?"

শারমীন মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। মানুষটা তার ব্যাগ খুলে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট বের করেছে, তার ভেতরে কালচে চারটি কলা এবং কয়েক টুকরো সস্তা কেক। শারমীন মাথা নাড়ল। বলল, "আমি এখন খাব না। আপনি খান। থ্যাংক ইউ!"

"তাহলে একটা কেক খান। কেকটা ভালো, এক পিস চার টাকা করে নিয়েছে।"

শারমীন একটু কৌতূহল নিয়ে চার টাকা পিসের কেকগুলো দেখল। কটকটে হলুদ রঙ, এক পাশে কাটা এবং সেখানে সাদা তৈলাক্ত কিছু লেপটে রয়েছে। মানুষটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "বাটার দেওয়া কেক। আপা খেয়ে দেখেন।"

খাবারের আয়োজন দেখে শারমীনের গা গুলিয়ে এলো কিন্তু সে সেটা বুঝতে দিল না, হাসি হাসি মুখে বলল, "আপনি খান। আমার একেবারে খিদে পায় নি। খেয়ে বের হয়েছি তো।"

"আমার আবার ট্রেনে উঠলেই খিদা পায়। তাই সব সময় খাবার নিয়া বার হই। রাস্তাঘাটের খাবার খাওয়া ঠিক না।"

শারমীন মাথা নেড়ে স্বীকার করল, রাস্তাঘাটের খাবার খাওয়া ঠিক না। মানুষটি ব্যাগ থেকে একটা কেক বের করে আবার শারমীনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আপা, খেয়ে দেখেন এক পিস।"

শারমীন জোরে জোরে মাথা নেড়ে জানাল, তার একেবারে খিদে পায় নি। মানুষটা তখন নিজেই কেকটি খেতে শুরু করল। শারমীন চোখের কোনা দিয়ে দেখল মানুষটা খাচ্ছে খুব তৃপ্তি করে। দুই পিস কেক এবং দুটো কলা শেষ করে বাকি খাবার আবার প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে সে ব্যাগে রেখে দেয়। একটা খালি পেপসির বোতলে করে পানি এনেছে, সেখান থেকে ঢকঢক করে কয়েক ঢোক পানি নিয়ে মানুষটা হাত দিয়ে মুখ মুছে শারমীনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার আবার খিদা বেশি।"

শারমীন হাসার চেষ্টা করে বলল, "ভালো। মানুষের স্বাস্থ্য ভালো হলে বেশি খিদে পায়।"

"আমার স্বাস্থ্য আরো ভালো ছিল আপা। গায়ের রঙটাও এত ময়লা ছিল না। হঠাৎ করে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেল।"

শারমীন ভদ্রতা করে বলল, "তাই নাকি ?"

"জি।" মানুষটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমার কপালটা আসলে ভালো না।"

"কেন ? কী হয়েছে ?"

"আমার একটা বিয়া ঠিক হইছিল আপা। মেয়ের বাপ খুব খানদানি মানুষ, নিজে আমারে পছন্দ করেছিলেন। আমি মেয়েটারেও দেখেছিলাম, স্বাস্থ্য ভালো, খুব সুন্দরী মেয়ে। মেয়ের বাবা নিজে আমাকে ডেকে বলেছিলেন, "বাবা, অনেক দিন থেকে আমি ভালো বংশের একটা ছেলে খুঁজতেছি। তুমি ভালো বংশের ছেলে। তোমার কাছে আমার মেয়ে দিতে চাই। তোমার কী মত ?" আমি বললাম, "মুরব্বিদের সঙ্গে আলাপ না করে তো কথা দিতে পারি না। তবে আমার মত আছে।" মেয়ের বাবা বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ! আমার ছেলে থাকে লন্ডনে, বিয়ের পরে মেয়ের সঙ্গে তোমারে আমি লন্ডনে পাঠায়া দেব।"

মানুষটা এই পর্যায়ে কথা বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শারমীন জিজ্ঞেস করল, "শেষপর্যন্ত বিয়েটা হলো না ?"

"না আপা। আমার কপাল খারাপ। বিয়ে হলে কি আর এখন এই দেশে থাকি ? তা হলে তো লন্ডনেই থাকি!"

"কেন হলো না বিয়েটা ?"

"শত্রুতা। গ্রামের লোক খবর পেয়ে শত্রুতা করল।"

"কীভাবে শত্রুতা করল ?"

মানুষটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার এক বিশাল গল্প ফেঁদে বসল। অনাবশ্যক এবং অপ্রয়োজনীয় কথাই বেশি, গল্পের মূল অংশ বুঝতে শারমীনের বেশ কষ্ট হলো। 'খানদানি' পরিবারের মেয়েটির সঙ্গে মানুষটার বিয়ে হয়ে যাবে শুনে গ্রামের কিছু মানুষের খুব হিংসে হওয়ার কারণে জাদুটোনা করে তাকে অসুস্থ করে ফেলা হয়েছিল— এই ধরনের একটা উদ্ভট গল্প লোকটা দীর্ঘ সময় নিয়ে বলে গেল। গল্পটির অনেক অংশই বিশ্বাসযোগ্য

নয় কিন্তু প্রশ্ন করে শারমীন দীর্ঘ গল্পকে আরো দীর্ঘ করার সাহস পেল না। মানুষটা গল্প শেষ করে হাতের চামড়া এবং মাথার পাতলা চুল দেখিয়ে বলল, "এই দেখেন গায়ের রঙের কী অবস্থা হয়েছে, চুল পড়ে মাথার কী অবস্থা দেখেন।"

শারমীন জিজ্ঞেস করল, "সব জাদুটোনার ফল ?"

"জি। কুকুরি কালাম দিয়ে বান মেরে দিলে খুব ভেজারাস।"

"রক্ষা পেলেন কেমন করে ?"

"জামে মসজিদের পেশ ইমাম একটা তাবিজ দিয়েছেন। এই যে দেখেন—।" লোকটা তার হাতে বাঁধা একটা হৃষ্টপুষ্ট তাবিজ দেখিয়ে বলল, "এই তাবিজ নেওয়ার পর থেকেই আমার শরীরটা ভালো হতে শুরু করেছে।"

শারমীন এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে। নিউইয়র্কে তার জার্মান বন্ধু আলবার্ট কিংবা ভেনিজুয়েলার মেয়ে গার্সিয়া এই মানুষটির গল্প শুনলে কী বলবে কে জানে!

মানুষটা লাজুক মুখে বলল, "আবার বিয়ার কথাবার্তা হচ্ছে আপা। এইবার বাইরের কেউ না, নিজেদের আত্মীয়স্বজনের ভিতরে বিয়া।"

"তাই নাকি ?"

"জি। মেয়েটার গায়ের রঙ খুব ফরসা না, আপনার থেকে একটু শ্যামলা হবে। তবে স্বাস্থ্য খুব ভালো। আর রান্না করে খুব সোন্দর। একেবারে ফাস ক্লাস।"

"তাই নাকি ?"

"জি। ভালো রান্না শুনেই আপা আমি একটু নরম হয়ে গেছি। আমি আবার ভালো খাওয়া-দাওয়া খুব পছন্দ করি।"

শারমীন বলল, "আচ্ছা আচ্ছা বেশ বেশ।"

মানুষটা সম্ভবত হঠাৎ খেয়াল করল যে, সে শুধু একাই কথা বলে যাচ্ছে। কথা বলা তার জন্য এক ধরনের আনন্দের ব্যাপার এবং এই আনন্দে শারমীনকে সুযোগ দেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করল, "আপা, আপনার ফ্যামিলি নাই ?"

শারমীনের হঠাৎ করে শাহেদের কথা মনে পড়ল। যদি শাহেদের সঙ্গে তার ডিভোর্স না হতো তাহলে এতদিনে কি তাদের দু-তিনজন বাচ্চাকাচ্চা থাকত না ? শারমীন বুকের ভেতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে, ছোট একটা শিশুকে বুকে চেপে ধরার জন্য আজকাল মাঝে-মধ্যে তার ভেতরে কেমন জানি অমানবিক

এক ধরনের ইচ্ছে চেপে বসে। যতই দিন যাচ্ছে, ততই যে সেই সম্ভাবনাটা তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সেটি কি সে বুঝতে পারে না ?

"নাই আপা ?"

শারমীন একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "না, নেই।"

মানুষটা কৌতূহলী হয়ে বলল, "বিয়া করেন নাই আপা ?"

শারমীন ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না চলন্ত ট্রেনে বসে অশিক্ষিত, অমার্জিত, নির্বোধ টাইপের একজন মানুষের সঙ্গে সে এ ধরনের একটা আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে বেশ সহজভাবেই বলল, "বিয়ে করেছিলাম, ভেঙে গেছে।"

"ইয়া মাবুদ!" মানুষটার বিস্ময় পুরোপুরি আন্তরিক। সে এবারে শরীর পুরোপুরো ঘুরিয়ে শারমীনের দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে ভাঙল আপা ?"

শাহেদের সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার পর অনেকেই সেটা জানতে চেয়েছিল, তবে এই মানুষটির মতো করে নয়, বেশ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভদ্রভাবে। এখনো যখন কোনো মানুষ তার কাছাকাছি চলে আসে, কারণটি জানতে চায়। সে কখনো কাউকে সত্যি কথাটি বলে নি, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছে মনের মিল হয় নি। দার্শনিকের মতো ব্যাখ্যা করেছে যে দুজন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ এত কাছাকাছি থাকাটাই বিস্ময়— কাউকে না কাউকে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যখন দুজনই স্বাধীনচেতা হয়ে যায়, বিয়েটা ধরে রাখা খুব কঠিন ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক কী কারণ জানা নেই, আজ শারমীন সেই প্যাঁচের মধ্যে গেল না; সোজাসুজি উত্তর দিল, "আমার যে স্বামী ছিল সে অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করেছিল।"

শারমীনের উত্তর শুনে মানুষটা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল। বলল, "নাউজুবিল্লাহ"।

মানুষটা শারমীনের কাছ থেকে আরো কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল কিন্তু শারমীন আর কিছু বলছে না দেখে শেষপর্যন্ত নিজেই জিজ্ঞেস করল, "কোন মেয়ে ? কাজের বুয়া ?"

শারমীন এবার হেসে ফেলল, "না, কাজের বুয়া না। আমার এক বান্ধবী। খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড।"

মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "এটা তো জেনা। জেনা খুব বড় গুনাহ। আপনার বান্ধবী উচিত কাজ করে নাই। হাশরের ময়দানে তার কঠিন বিচার হবে।"

শারমীন অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, সে সব কিছু চিন্তা করেছে কিন্তু অশোকার সঙ্গে শাহেদের সম্পর্কটা পাপ ছিল কি না সেটা সে কখনো চিন্তা করে দেখে নি। পৃথিবীর সবকিছু কি ন্যায়-অন্যায় হিসেবে ভাগ করা যায় ? পাশে বসে থাকা মানুষটি অবশ্য এত জটিল জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাল না। গম্ভীর মুখে বলল, "আপনি মনে কিছু নিবেন না আপা, পুরুষ মানুষ হচ্ছে আগুনের মতো আর মেয়ে লোক হচ্ছে কেরোসিন। কাছাকাছি থাকলে যদি সাবধান না থাকে তাহলে আগুন ধরে যায়।"

মানব-মানবীর রহস্যময় সম্পর্ক নিয়ে মানুষটার এই আশ্চর্য সরলীকরণের ক্ষমতা দেখে শারমীন একেবারে থ হয়ে গেল। ব্যাপারটির খুঁটিনাটি নিয়ে তার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল, কিন্তু শারমীন সেই জটিলতায় গেল না। জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো একজন পুরুষ মানুষ— আপনার কি সব সময় নিজেকে আগুন আগুন মনে হয় ?"

শারমীনের প্রশ্ন শুনে মানুষটা থতমত খেয়ে বোকার মতো একটু হেসে ফেলে বলল, "আমরা অশিক্ষিত মূর্খ মানুষ, আমাদের কথা আলাদা।"

"অশিক্ষিত মূর্খ মানুষেরা কি পুরুষ মানুষ না ?"

মানুষটাকে এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে মোটেও উৎসাহী দেখা গেল না। সে বরং পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, "জামে মসজিদের পেশ ইমাম খুব ভালো তাবিজ দেন।"

শারমীন ভ্রু কুঁচকে বলল, "কিসের তাবিজ ?"

"ঘরের বৌয়ের জন্য মহব্বতের তাবিজ।"

শারমীন দৃশ্যটি কল্পনা করল, শাহেদকে তার প্রতি আসক্ত করার জন্য সে গলায় ঘণ্টার মতো একটা তাবিজ ঝুলিয়ে ঘুরছে। ব্যাপারটা চিন্তা করে তার হঠাৎ করে হাসি পেয়ে যায়। কষ্ট করে হাসি আটকানোর চেষ্টা করার পরও মানুষটা সেটি দেখে ফেলল। মুখ গম্ভীর করে বলল, "আপনি বিশ্বাস করলেন না আপা ? আমার আপন ফুপাতো ভাইয়ের এই বদ খাসলত ছিল। ভাবি ইমাম সাহেবের কাছ থেকে এক খিলি পান পড়ায়ে আনছে, ব্যস, এক

খিলিতেই কাম হয়ে গেছে। ভাই এখন বিলাইয়ের মতো ভাবির পিছনে পিছনে ঘুরে!"

একজন পুরুষ মানুষ বিড়ালের মতো তার স্ত্রীর পেছনে পেছনে ঘুরছে— দৃশ্যটি কল্পনা করে শারমীন এবারে বেশ শব্দ করেই হেসে ফেলল। হাসিটি অবিশ্বাসের হাসি নয়। কৌতুকের হাসি। মানুষটা তাই কিছু মনে করল না। একটু অপেক্ষা করে সে-ও হাসিতে যোগ দিয়ে দেয়।

ট্রেনের হুইসেল শুনে শারমীন মাথা বের করে তাকায়। ট্রেনের গতি কমে আসছে, বাইরে লোকালয় দেখা যাচ্ছে— কোনো একটা স্টেশন আসছে মনে হয়। যাত্রীদের কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শারমীনের পাশে বসে থাকা মানুষটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "প্লাটফর্মে একটু হেঁটে আসি। শরীরে জুত হচ্ছে না।" মানুষটা ওপরের তাকে রাখা জীর্ণ একটা ব্যাগ দেখিয়ে বলল, "আপা, আমার ব্যাগটা একটু দেখবেন।"

শারমীন মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে, দেখব।"

ব্যাপারটা কীভাবে শুরু হলো শারমীন ঠিক বুঝতে পারল না। ট্রেনের দরজায় বেশ ভিড়, মানুষ ধাক্কাধাক্কি করে নামছে এবং উঠছে। তার মধ্যে হঠাৎ করে একজন মানুষ চিৎকার করে উঠল, "ধর ধর!"

শারমীন দেখল আট-দশ বছরের একটা বাচ্চা ভিড়ের ভেতর থেকে বের হয়ে গুলির মতো ছুটতে ছুটতে কিছু বোঝার আগে মানুষের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শারমীন দেখতে পায়, কালো রঙের শক্তসমর্থ একজন মানুষ প্রায় একই বয়সী অন্য একটা বাচ্চাকে ধরে চিৎকার করছে। কী হয়েছে সে বুঝতে পারল না। কিন্তু হঠাৎ করে চমকে উঠে দেখল কালো মানুষটা ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে মুখে একটা ঘুসি মেরে বসল। এত ছোট বাচ্চাকে এত নির্দয়ভাবে কেউ মারতে পারে শারমীন নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না। ছেলেটা দুই হাতে মুখ চেপে ধরে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে কিন্তু কোনো লাভ হয় না। মানুষটা এবারে নির্দয়ভাবে ডানে-বামে মারতে শুরু করে। শারমীনের মনে হলো বাচ্চাটা বুঝি এখনই মরে যাবে, সে ট্রেনের জানালা দিয়ে শরীরের যেটুকু সম্ভব বের করে চিৎকার করতে থাকে, "কী করছেন আপনি, কী করছেন? বাচ্চাটা মরে যাবে তো।"

ট্রেনের দরজার আশপাশে মানুষের ভিড়ের মধ্যে কেউ শারমীনের কথা শুনল না। শারমীন দেখল, মানুষটা বাচ্চাটাকে লাথি মারল এবং লাথি খেয়ে বাচ্চাটা শক্ত প্লাটফর্মে আছাড় খেয়ে পড়ল। সেই অবস্থায় মানুষটা ছুটে এসে তাকে আরো কয়েকটা লাথি মারল। শারমীনের মনে হলো, সে আর সহ্য করতে পারছে না। চিৎকার করে বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে এখানে? বাচ্চাটাকে মারছে কেন?"

প্লাটফর্মের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ বলল, "পকেটমার।"

"পকেটমার হলে মারবে কেন? পুলিশকে দেয় না কেন?"

"পুলিশকে দিলে লাভ নাই— পুলিশ ছেড়ে দেয়।"

"তাই বলে এইটুকুন বাচ্চাকে মারবে?"

মানুষটা কোনো কথা না বলে পিচিক করে থুতু ফেলে ব্যাপারটা আরো ভালো করে দেখার জন্য এগিয়ে গেল। শারমীন দেখতে পেল শক্তসমর্থ কালো মানুষটা ছোট বাচ্চাটার ওপর লাফাচ্ছে, জুতো দিয়ে মাড়িয়ে হাত ও পায়ের আঙুলগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে— ছোট বাচ্চাটা আর্তনাদ করে গড়াগড়ি করছে, রক্তে সারা মুখ মাখামাখি হয়ে গেছে। শারমীন আবার চিৎকার করে বলল, "প্লিজ, কেউ একজন থামান, মেরে ফেলবে বাচ্চাটাকে। মেরে ফেলবে!"

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজন বলল, "মেরে ফেলাই উচিত। মহাবদমাইশ, পকেট মেরেই দেখলেন না— আরেকজনকে দিল ব্যাগটা, সেই শালা পালিয়ে গেল।"

"আপনি কেমন করে জানেন?"

মানুষটা উত্তর না দিয়ে ঠোঁট উল্টে সরে গেল। এমন সময় শারমীন ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণ তার পাশে বসে থাকা সহযাত্রী মানুষটাকে দেখতে পায়, খুব কায়দা করে মুখে একটা সিগারেট চেপে ধরে ছোট বাচ্চাটাকে মারার দৃশ্যটি বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখছে। এ রকম ভয়ঙ্কর নৃশংস একটি দৃশ্য দেখেও মানুষটার মুখে কোনো বিকার নেই। মানুষটার নাম জানা হয় নি; তাই শারমীন হাত তুলে চিৎকার করে ডাকল, "এই যে, এই যে শোনেন।"

শারমীনের চিৎকার শুনে মানুষটা ঘুরে তাকাল এবং গুরুজনকে দেখে মানুষ যেভাবে সিগারেট লুকিয়ে ফেলে সেভাবে হাতের তালুতে সিগারেট লুকিয়ে তার দিকে এগিয়ে এলো। শক্তসমর্থ কালো মানুষটা এবার বাচ্চা ছেলেটাকে টেনে তুলেছে। চিৎকার করে কী একটা বলে চুলের মুঠি ধরে ট্রেনের বগিতে মাথাটাকে গায়ের জোরে ঠুকে দিল। শারমীনের মনে হলো বাচ্চাটার মাথা ফেটে ঘিলু বুঝি ছিটকে বের হয়ে আসবে।

"বাচ্চাটাকে বাঁচান, প্লিজ বাঁচান!"

"পকেটমার আপা।"

"তাতে কী হয়েছে— বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে তো! বাঁচান, বাচ্চাটাকে বাঁচান!"

মানুষটাকে একটু দ্বিধান্বিত দেখায়— শারমীন চাপা গলায় বলল, "ওই মানুষটার কত টাকা চুরি গেছে?"

"জানি না আপা।"

"গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, বলেন যত টাকা চুরি গেছে আমি দেব।" মানুষটা অবাক হয়ে শারমীনের দিকে তাকাল, মনে হলো ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, শারমীন সুযোগ দিল না। বলল, "যান তাড়াতাড়ি, প্লিজ!"

মানুষটা এবারে ভিড়ের দিকে এগিয়ে যায়, শারমীন দেখল কাছে গিয়ে হাত-পা নেড়ে কথা বলছে। এক পর্যায়ে হাত তুলে শারমীনকে দেখাল এবং সবাই মাথা ঘুরিয়ে শারমীনের দিকে তাকাল। যে মানুষটা বাচ্চাটাকে মারছে সে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কিছু একটা বলল, উত্তরে মানুষটাও রেগে কিছু একটা বলল। শারমীন দেখল তখন সবাই এদিকে হেঁটে আসতে শুরু করেছে। বাচ্চাটা হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছিল; তাকে কোনোভাবে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতেই শারমীন তীব্র গলায় বলল, "আপনি কি এই বাচ্চাটিকে মেরে ফেলবেন নাকি?"

"এটা পকেটমার।"

"পকেটমার হলেই এভাবে মারতে হয়?"

"না মারলে এই হারামজাদা বলবে মানিব্যাগ কোথায়?"

"সেই জন্য আপনি এই বাচ্চা ছেলেটাকে এভাবে মারবেন?"

শক্তসমর্থ কালো মানুষটা বাচ্চা ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "একশবার মারব। হারামজাদাকে পিটিয়ে আমি তার সবকটা হাড্ডি ভেঙে ফেলব। দরকার হলে শুয়োরের বাচ্চার চোখ তুলে ফেলব।"

শারমীন বলল, "কী বলছেন আপনি? দেশে আইন নাই?"

"জি না। এই দেশে কোনো আইন নাই।"

শারমীন তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "আপনি দেখতে চান দেশে আইন আছে কিংবা নাই?"

মানুষটি অবাক হয়ে শারমীনের মুখের দিকে তাকাল, দেখল, সাদাসিধে এই মহিলাটির মুখে হঠাৎ করে বেমানান বিস্ময়কর অবিশ্বাস এক ধরনের কাঠিন্য চলে এসেছে। শারমীন আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি দেখতে চান আপনাকে আমি দশ মিনিটের মধ্যে অ্যারেস্ট করাতে পারি কি না?"

এই প্রথমবার শক্তসমর্থ মানুষটার চোখে ভয়ের একটা অস্পষ্ট ছাপ পড়ল, শারমীনের সেটা চোখ এড়াল না। সে শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনার মানিব্যাগে কত টাকা ছিল?"

"চৌদ্দ শ' টাকা।"

"এই নেন— আপনাকে আমি চৌদ্দ শ নয়, পনেরো শ টাকা দিচ্ছি"— শারমীন তার ব্যাগ খুলে তিনটা পাঁচ শ টাকার নোট বের করে এগিয়ে দেয়, "আপনি এই মুহূর্তে এই বাচ্চাটাকে ছেড়ে দেন।"

শক্তসমর্থ মানুষটা কয়েক মুহূর্ত শারমীনের চোখের দিকে তাকিয়ে বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটি এলিয়ে নিচে পড়ে যায়।

ট্রেন হুইসেল দিল এ সময়ে। যারা মজা দেখার জন্য ট্রেন থেকে নেমে এসেছিল তারা এবার নিজেদের বগির দিকে ছুটে যেতে শুরু করে। কিছুক্ষণেই জায়গাটা মোটামুটি ফাঁকা হয়ে গেল। শারমীন দেখল সবুজ ভেলভেটের প্যান্ট পরা সাদাসিধে মানুষটা বাচ্চাটার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "এই হারামজাদা পকেটমারের বাচ্চা, ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে, ট্রেনে ওঠ। এইখানে থাকলে এ লোক তোকে খুন করে ফেলবে।"

কথাটা সত্যি, বাচ্চাটার মুখে স্পষ্ট একটা ভয়ের ছাপ পড়ল— সে কোনোভাবে ওঠার চেষ্টা করে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। ট্রেনটি তখন নড়তে শুরু করেছে, ছেলেটি নিজে নিজে উঠতে পারবে না। মানুষটা তখন ছেলেটাকে টেনে কোনোভাবে ট্রেনে তুলে দিল, বাচ্চাটার তখন যন্ত্রণায় চিৎকার করারও ক্ষমতা নেই।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে, বগির সব মানুষই মাথা ঘুরিয়ে শারমীনকে দেখার চেষ্টা করছে। অত্যন্ত অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার। সে আজকে এই ট্রেনে কোনোভাবেই আলাদা করে কারো চোখে পড়তে চাইছিল না— কিন্তু এখন ঠিক সেই জিনিসটাই ঘটে বসে আছে। যদি কেউ তাকে চিনে ফেলে তখন কী হবে? শারমীন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা খবরের কাগজ খুলে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করল।

মিনিট কয়েক পরে শারমীনের পাশের সিটের মানুষটি তার জায়গায় এসে বসে সাংঘাতিক একটা ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পর মানুষের যে ধরনের অব্যয় ধ্বনি বের করার কথা সেগুলো বের করে একটা রুমাল দিয়ে নিজের ঘাড়টা মুছতে শুরু করল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপা, আপনার খুব তেজ।"

এটা কি প্রশংসা নাকি আশঙ্কা শারমীন ঠিক বুঝতে পারল না। তাই তার কোনো উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ছেলেটার কী অবস্থা ?"

মানুষটি হাত নেড়ে বলল, "ছেলেরে নিয়ে চিন্তা করবেন না। এরা হচ্ছে বিচ্ছু!"

"হাত-পা কিছু ভেঙেছে ?"

"মনে হয় না। দেখে আসছি উঠে বসেছে। চোর-পকেটমারের এক নম্বর ট্রেনিং হচ্ছে মার খাওয়ার ট্রেনিং। এদের মার খেয়ে কিছু হয় না।"

শারমীন ভুরু কুঁচকে বলল, "কী বলছেন আপনি ?"

"জি আপা ঠিকই বলছি। তবে এই কাজে ছোট পোলাপানরে ব্যবহার করা ঠিক না।"

শারমীন কিছু না বলে বাইরে তাকিয়ে রইল। মানুষটি বলল, "তবে আমি যেটা বলছিলাম আপা—"

"কী বলছিলেন ?"

"আপনার তেজ বড় সাংঘাতিক। এমন পষ্ট করে বললেন যে ওই শালাও ঘাবড়ে গেল।" দৃশ্যটির কথা চিন্তা করে মানুষটার এক ধরনের আনন্দ হয়। দুলে দুলে সে হাসতে শুরু করে।

শারমীন কোনো কথা বলল না। মানুষটা একটু পরে হাসি থামিয়ে বলল, "তবে আপা আপনাকে একটা জিনিস বলি।"

"কী জিনিস ?"

"আপনার এই তেজ কিন্তু আপনার জন্য খুব বড় বিপদ আনতে পারে।"

"বড় বিপদ ? কেন ?"

"এই দেশে মেয়েছেলের তেজ কেউ পছন্দ করে না।"

শারমীন একটা নিঃশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, মানুষটা মনে হয় সত্যি কথাই বলছে। এ দেশে মেয়েদের তেজ কেউ পছন্দ করে না। তাই মেয়েদের অনেক কষ্ট করে ভীরু হতে শেখানো হয়— তাকেও শেখানো হয়েছিল।

তখন তার বয়স ছিল চৌদ্দ। তার বাবার একজন বন্ধু, কয়েস চাচা, প্রায়ই তাদের বাসায় আসতেন— খুব স্নেহ করতেন তাদের। শুধু শারমীন জানত স্নেহটা জানি কেমন রকম। কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারত না। বললেও নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাস করত না— ভাবত, ছি, এই মেয়েটার মনটা কী নোংরা!

পরীক্ষার আগে কয়েস চাচা একদিন বললেন, "শারমীন, মা তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?"

শারমীন মাথা নেড়ে বলল, "ভালো চাচা।"

বাবা বললেন, "তোর কয়েস চাচা কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। কোনো কিছু না বুঝলে চাচাকে জিজ্ঞেস করিস।"

কয়েস চাচা বললেন, "হ্যাঁ মা, কোনো লজ্জা করো না।"

শারমীন বলল, "করব না।"

শারমীন অবশ্যি কোনোদিন কিছু জিজ্ঞেস করে নি। একদিন কয়েস চাচা নিজে থেকে চলে এলেন, বাসায় কেউ নেই, শুধু বুয়া রান্নাঘরে রান্না করছে। শারমীন তার ঘরে বসে পড়ছিল, দরজায় শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখে কয়েস চাচা। কয়েস চাচা হেসে বললেন, "পড়ছ, মা ?"

"হ্যাঁ।"

"পড় পড়, ভেরি গুড!"

শারমীন বলল, "বাবা-মা এক্ষুণি চলে আসবেন। আপনি বসেন।"

"হ্যাঁ, বাইরের ঘরে একা বসে কী করব, তাই তোমার কাছে চলে এলাম। দেখি তুমি কী পড়।" কয়েস চাচা হাসলেন— খুব সুন্দর করে হাসি।

শারমীন টেবিলে পড়ায় মন দিল, হঠাৎ করে সে অনুভব করে তার ঘাড়ে কয়েস চাচার নিঃশ্বাস, এক মুহূর্ত পরে সে বুঝতে পারল দুটি ঠোঁট তার গলায় স্পর্শ করেছে। শারমীন কী করবে বুঝতে পারল না— পাথরের মতো বসে রইল, তখন অনুভব করল একটা হাত তার শরীরকে স্পর্শ করার জন্য কাপড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

শারমীন তখন ভীতু ছিল। ভীতু আর দুর্বল। তাই সে চেয়ারে পাথরের মতো বসে থেকে সেই মানুষটাকে তার শরীর স্পর্শ করতে দিয়েছিল— কী ভয়ঙ্কর সেই অনুভূতি— দুই যুগ পরেও শারমীনের সারা শরীর ঘেন্নায় সঙ্কুচিত হয়ে আসতে চায়। শারমীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরো দৃশ্যটা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করল। কোথায় আছেন এখন কয়েস চাচা ? একবার কিছুদিনের জন্য সময় নিয়ে এসে মানুষটাকে খুঁজে বের করা যায় না ? তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করা যায় না, "চাচা, আপনার মনে আছে আপনি কী করেছিলেন ?" সম্মানিত বৃদ্ধ মানুষটার বুকের কাপড় ধরে টেনে বাইরে এনে রাস্তায় সব মানুষকে ডেকে এনে বলা যায় না, "এই যে ভাইয়েরা আপনারা দেখে যান— আমার বয়স যখন মাত্র চৌদ্দ বছর তখন এই মানুষটা, এই নোংরা

মর্দমার কীট আমার শরীরে হাত দিয়েছিল। গত তেইশ বছর থেকে আমার মনে হয় শরীরটা নোংরা হয়ে আছে!"

শারমীন এখন আর ভীতু না। সে দুর্বল না। তার সাহস বেশি— তেজও বেশি। এই মানুষটা হয়তো ঠিকই বলেছে এই তেজের জন্য, একদিন সে হয়তো বিপদে পড়বে। খুব বড় বিপদে পড়বে। পড়ুক!

পাশে বসে থাকা মানুষটি তার ব্যাগ খুলে আবার তার প্লাস্টিকের ব্যাগটা বের করল, ভেতরে এখনো দুটি কলা এবং চার টাকা দামের ক্যাটক্যাটে হলুদ রঙের কেক। মানুষটি একটু আগেই খেয়েছে— এর মাঝে আবার তার খিদে পেয়ে গেল?

শারমীনের দিকে তাকিয়ে বলল, "পকেটমার ছেলেটারে কিছু খেতে দেই। মার খেয়ে তো আর পেট ভরে না।" খুব উঁচুদরের রসিকতা করে ফেলেছে এমন ভান করে মানুষটা হি হি করে হাসতে থাকে।

একটা জীর্ণ কলা এবং ক্যাটক্যাটে হলুদ রঙের চার টাকা দামের এক পিস কেক নিয়ে মানুষটা উঠে গেল— ছেলেটাকে দেখার একটু কৌতূহল হচ্ছিল, কিন্তু শারমীন ট্রেনের বগি বোঝাই মানুষের কৌতূহলী চোখের সামনে হেঁটে যাওয়ার সাহস করল না। সে তার ব্যাগের ভেতর থেকে একটা বই বের করল, রাস্তায় পড়ার জন্য এনেছিল— রজার পেনরোজের *শ্যাডোজ অব দ্য মাইন্ড*। ট্রেনে পড়ার জন্য বইটা হয়তো একটু বেশি কঠিন হয়ে গেছে, হালকা একটা প্রেমের উপন্যাস নিয়ে এলে হতো— যে উপন্যাসের চরিত্রগুলো কে কী করবে কয়েক পৃষ্ঠা পড়লেই অনুমান করে ফেলা যায়।

উপন্যাসে কত সহজেই সবকিছু বুঝে ফেলা যায় কিন্তু সত্যিকার জীবনটি এত বিচিত্র কেন? শারমীন একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার হঠাৎ করে নাজনীনের কথা মনে পড়ল। নাজনীন ছিল শারমীনের দুই বছরের ছোট— তাদের পরিবারের সবচেয়ে হাসিখুশি মেয়ে। পড়াশোনায় ভালো ছিল, খবরের কাগজে লেখালেখি করত, স্কুল থেকে ডিবেট টিমে টেলিভিশনে ডিবেট করতে যেত। সায়েন্স ফেয়ারে কাগজ তৈরির প্রজেক্ট করে একবার একটা গোল্ড মেডেল পেয়ে গেল। বাবার খুব গর্ব ছিল নাজনীনকে নিয়ে— সব সময় বলতেন আমার এই মেয়েটি একদিন দেশের প্রাইম মিনিস্টার হবে।

সেই নাজনীন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর সবুজ নামে একটা ছেলের প্রেমে পড়ল। চালচুলোহীন হতচ্ছাড়া একটা ছেলে, লিটল ম্যাগাজিন বের করে, নাটকের গ্রুপে কাজ করে উস্কখুস্ক দাড়ি নিয়ে ঘূর্ণিঝড় বন্যার সময় রিলিফ সংগ্রহ

করে। নাজনীনকে কিছুতেই বোঝানো গেল না জীবনটা উপন্যাসের পৃষ্ঠা না— জীবনটা অনেক কঠিন। বাবা একদিন অসম্ভব রাগ করে নাজনীনকে বললেন, "বের হয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।"

নাজনীন কোনো কথা না বলে এক কথায় বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। যে মেয়েটার ইউনিভার্সিটিতে ঝকঝকে উজ্জ্বল একটি মেয়ে হয়ে সব ছেলের বুকের দীর্ঘশ্বাসকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করার কথা সে বাবা-খেদানো চালচুলোহীন একটা ছেলেকে বিয়ে করে প্রায় বস্তির মতো একটা জায়গায় উঠে গেল। শারমীন লুকিয়ে মাঝে মাঝে নাজনীনকে দেখতে যেত— ছোট একটা ঘরে ময়লা বিছানায় দুজনে পাশাপাশি বসে থাকত, কী নিয়ে কথা বলবে কেউ বুঝতে পারত না।

নাজনীন প্রাইভেট বিএ পরীক্ষা দেয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু দিতে পারল না। তার মাঝে একদিন জানতে পারল নাজনীনের বাচ্চা হবে। বাচ্চা জন্মানোর সময় নাজনীন মারা গেল— ঠিক কী হয়েছিল কেউ ভালো করে জানে না। ভালো ক্লিনিকে যাবার পয়সা ছিল না— শেষ মুহূর্তে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। যখন তারা খবর পেয়েছে তখন সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, হাসপাতালে গিয়ে দেখে একটা সাদা কাপড় দিয়ে নাজনীনকে ঢেকে রেখেছে। সাদা কাপড়ের নিচে থেকে নাজনীনের শুকনো পা দুটি বের হয়েছিল— কী ভয়ঙ্কর করুণ সেই দৃশ্য!

তারপর আস্তে আস্তে নাজনীনের কথা সবাই ভুলে গেল— যেন নাজনীন নামে কেউ তাদের পরিবারে ছিল না— কখনো তার জন্ম হয় নি— কখনো তার মৃত্যুও হয় নি। শারমীন এতদিন পর এখন মাঝে মাঝে নাজনীনের কথা ভাবে, কেন তার মতো একটা মেয়ে এভাবে তার জীবনটাকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল? উপন্যাসের কোনো চরিত্র তো এরকম করে না। উপন্যাসের চরিত্রে মানুষদের ভেতরে স্বপ্ন থাকে, আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে, এরকম ভয়ঙ্করভাবে কেউ তো নিজেকে নিঃশেষ করে দেয় না।

রজার পেনরোজের বইটা খুলে রেখে শারমীন জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে, ট্রেনের ঝাঁকুনিতে তার চোখে ঘুম নেমে আসছে। বইটা বুকে চেপে ধরে রেখে শারমীন নিজের অজান্তেই এক সময় ঘুমিয়ে গেল।

ট্রেনে কিংবা গাড়িতে ঘুমিয়ে গেলে ঘুমটা হয় ছাড়া ছাড়া। যতক্ষণ ট্রেন বা গাড়ি চলতে থাকে ততক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা যায় কিন্তু থেমে গেলেই ঘুম ভেঙে যায়। শারমীনের ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। পাশের সাদাসিধে সহযাত্রীটি নেই। সে জানালা দিয়ে মাথা বের করে বাইরে তাকাল। ছোট একটা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে, প্লাটফর্মে মানুষজন নেই— আন্তঃনগর ট্রেনগুলোর মাঝখানে একটা-দুটো বড় স্টেশন ছাড়া অন্য স্টেশনে থামার কথা নয়— এখানে কেন থামল কে জানে। পাশে মানুষটি বসে থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেত— সে নিশ্চয়ই খোঁজখবর নিয়ে আসত। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। শারমীন জানালা দিয়ে মাথা বের করে ছোট স্টেশনটির দিকে তাকিয়ে থাকে— প্রথমে মনে হয়েছিল এখানে বুঝি দেখার কিছু নেই কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আবিষ্কার করল সেটা সত্যি নয়। যে মানুষটি চা তৈরি করছে তার চা বানানোর প্রক্রিয়াটিই সারা দিন ধরে দেখা যায়— কিংবা যে মানুষটি চা খাচ্ছে তার চা খাওয়ার ভঙ্গিটি কী মজার একটি দৃশ্য! ঝাল-মুড়িওয়ালা আগে বিশেষ কিছু বিক্রি করতে পারে নি কিন্তু এখন তার এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। মনে হচ্ছে হঠাৎ করে ট্রেনের সব প্যাসেঞ্জার ঝালমুড়ি খাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে গেছে। প্লাটফর্মে একজন মহিলা আরেকজনের মাথা থেকে উকুন তুলছে— এই দৃশ্যটি দেখলে সিলভিয়া কী করবে ? নিউইয়র্কে খবরের কাগজে একবার রিপোর্ট বের হলো কোন স্কুলের বাচ্চার মাথায় উকুন নাকি পাওয়া গেছে, সেটি পড়েই সিলভিয়ার সে কী উত্তেজনা! এই স্টেশনে শুধু কি মানুষ— একটি ভেড়া সমস্ত পৃথিবীর প্রতি নিরাসক্তভাবে ট্রেন লাইনের

একমাথা থেকে হেঁটে হেঁটে আসছে, একটু ভালো করে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে ভেড়াটি আসলে মোটেই নিরাসক্ত নয়, তার দৃষ্টি কলার ছিলকের দিকে। ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা কলা খেয়ে ছিলকে ফেলছে আর সে একটি একটি করে খেয়ে খেয়ে আসছে, একটিও মিস যায় নি!

এ রকম সময় শারমীন ট্রেনের শব্দ শুনতে পেল, পাশের লাইন দিয়ে সামনে থেকে একটা ট্রেন আসছে। তার মানে এখানে একটা ক্রসিং হবে সে জন্য তাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে। বাবার কাছে শুনেছিল ক্রসিংয়ের নিয়মটি হচ্ছে পক্ষপাতিত্বের নিয়ম, যে আগে আসবে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যে পরে আসবে সে চলে যাবে আগে। তাদের ট্রেনটা আগে এসেছে বলে দাঁড়িয়ে আছে, এই ট্রেনটা সোজা চলে যাবে।

দেখতে দেখতে ট্রেনটা এসে গর্জন করে চলে যেতে লাগল, বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল চোখেমুখে। ট্রেনের মানুষগুলোকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, মনে হয় তাদের দিকে এক ধরনের তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে, বলছে "কেমন তোমরা দাঁড়িয়ে আছ অনুগত ভৃত্যের মতো— আর দেখো আমরা চলে যাচ্ছি রাজার মতো!" দেখতে দেখতে বিশাল ট্রেনটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এখন নিশ্চয়ই তাদের ট্রেনটা ছাড়বে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল— চায়ের দোকান থেকে সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানুষ বের হয়ে আসে— ট্রেনের যাত্রী, মনে হয় এরা সময় কাটানোর জন্য চা খেতে গিয়েছিল। শারমীন তার পাশের সিটের সহযাত্রী সবুজ ভেলভেটের প্যান্ট পরা সাদাসিধে মানুষটিকেও দেখতে পায়। একটা সিগারেট টানতে টানতে এগিয়ে আসছে। কিছু কিছু মানুষ আছে তারা ইচ্ছে করে সবকিছু করে শেষ মুহূর্তে। ট্রেনটা যখন ছেড়েই দেবে তখন তাড়াতাড়ি উঠে গেলে কী হয় ? কিন্তু মানুষগুলো উঠবে না— একেবারে শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠবে!

ট্রেনটা নড়তে শুরু করেছে তখন প্রায় একসঙ্গে সবাই ট্রেনের দিকে ছুটে এলো। শারমীন তার সাদাসিধে সহযাত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে— মানুষটা সিগারেটটায় একটা লম্বা টান দিয়ে ট্রেনের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ করে কী দেখে যেন দাঁড়িয়ে গেল। শারমীন মানুষটির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল, দেখল রঙ ওঠা স্যুটকেস হাতে একজন মানুষ এবং তার পেছনে পেছনে বাচ্চা কোলে একটা বউ ট্রেন ধরার জন্য ছুটে আসছে। ট্রেনের গতি দেখতে

দেখতে বেড়ে যাচ্ছে, শারমীন এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে হঠাৎ করে বুঝতে পারল এই পরিবারটি ট্রেনে উঠতে পারবে না। স্যুটকেস হাতে মানুষটি দৌড়ে এসে ট্রেনে স্যুটকেসটা রেখে পাদানিতে পা দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছে। বউটি বাচ্চা কোলে ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছে, কিন্তু এক হাতে বাচ্চা ধরে রেখেছে বলে উঠতে পারছে না। তার স্বামী হাত বাড়িয়ে বউকে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। বউটা প্রাণপণে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াচ্ছে, তার চোখেমুখে হঠাৎ এক ধরনের অবর্ণনীয় অসহায়ত্ব। ট্রেনের বেগ বেড়ে যাচ্ছে— প্রতি মুহূর্তে ট্রেনে ওঠার কাজটি আরো কঠিন হয়ে যাচ্ছে— কী হবে এখন ?

শারমীন দেখল সবুজ ভেলভেটের প্যান্ট পরা মানুষটা তার সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে বউটির কাছে ছুটে গিয়েছে। কিছু বোঝার আগে বাচ্চাটিকে টান দিয়ে নিজের হাতে নিয়ে বউটিকে ট্রেনে উঠতে বলছে। হাত মুক্ত হয়েছে বলে বউ এবার ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরে ওপরে উঠে গেছে— নিচে রয়ে গেছে তার বাচ্চা! মানুষটি দুই হাতে বাচ্চাটিকে নিয়ে তখন ট্রেনের পাশাপাশি ছুটছে, বাচ্চাটি অবর্ণনীয় আতঙ্কে চিৎকার করে কাঁদছে। মনে হচ্ছে স্টেশনে বাচ্চাটিকে নিয়ে এই মানুষটি বুঝি রয়ে যাবে।

কিন্তু না, ট্রেনের দরজা দিয়ে হাত বের করে শক্ত হাতে একজন বাচ্চাটিকে তুলে নিল— এখন রয়ে গেছে শুধু এই মানুষটি! নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে শারমীন, লোকটা কি উঠতে পারবে চলন্ত ট্রেনে ? ছুটতে ছুটতে মানুষটা দুই হাতে একটা হ্যান্ডেল ধরে ফেলেছে, এখন ওঠার চেষ্টা করছে। দুই পা এখনো প্লাটফর্মে। প্রাণপণে ছুটছে সেই দুটি পা দিয়ে, মনে হয় শরীরের ওপরের আর নিচের অংশ বুঝি আলাদা আলাদা দুটি অংশ, সেই দুটি অংশ প্রাণপণ চেষ্টা করছে একত্র হওয়ার জন্য। মানুষটি লাফিয়ে পাদানিতে পা দেওয়ার চেষ্টা করল— পারল না। নিচের অংশ এখন ঝুলে আছে বিপজ্জনকভাবে। শারমীন একটা আর্তচিৎকার করল, দেখল ট্রেনের নিচে চলে যাচ্ছে শরীর— তার মধ্যে কীভাবে জানি মানুষটা লাফ দিল আবার— পাদানিতে পা উঠে গেছে এবার। ট্রেনের ভেতর থেকে কয়েকটা হাত ধরে ফেলেছে এই মানুষটাকে! শারমীন একটা নিঃশ্বাস ফেলে ট্রেনের সিটে মাথা রাখল, এখনো আতঙ্কে তার শরীর কাঁপছে।

ট্রেনের দরজার কাছাকাছি খুব হৈচৈ, চেঁচামেচি হচ্ছে, সহযাত্রী মানুষটার গলা শোনা যাচ্ছে সবার ওপর, চিৎকার করে গালাগাল করছে মনে হয়। করতেই

পারে— এই মানুষটি না থাকলে কিছুতেই বউটি ট্রেনে উঠতে পারত না, বাচ্চাটিকে ট্রেনে তুলতে গিয়ে মানুষটি আরেকটু হলে নিজেই মারা পড়ত, কী সর্বনাশ! ওয়াশিংটন ডিসিতে একবার ট্রেনে ওঠার আগেই ট্রেনের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বিপজ্জনক ভ্রমণের গল্প বলতে চাইলে সেই গল্পটাই সবাই কতবার করে বলে— আজকের এই ঘটনাটা হলে তারা কী করত ?

শারমীন তার সাদাসিধে সহযাত্রী মানুষটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, মানুষটা এলে তাকে এ রকম ঝুঁকি নেওয়ার জন্য একটু বকে দেওয়া উচিত। মানুষটি অবশ্যি এলো না, দরজার কাছাকাছি শুধু উত্তেজিত কথা শোনা যেতে লাগল। শারমীন তার বইটি খুলে আবার পড়তে শুরু করল।

মিনিট দশেক পর সহযাত্রী মানুষটি হাজির হলো— তবে একা নয়, কোলে একটি ছোট বাচ্চা। শারমীন বাচ্চাটাকে চিনতে পারল, কিছুক্ষণ আগে এই বাচ্চাটিকে ট্রেনে তোলার জন্য মানুষটি আরেকটু হলে ট্রেনে কাটা পড়ত। মানুষটি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে তার পাশে বসতে বসতে বলল, "আপা এই বাচ্চাটারে দেখেন— কী মায়া লাগে।"

শারমীন বাচ্চাটাকে দেখল, বাংলাদেশের সব বাচ্চার মাথা ন্যাড়া না হয় ছোট ছোট চুল— এই বাচ্চাটিও তার ব্যতিক্রম নয়, মাথায় ছোট ছোট চুল এবং কপালের ডান পাশে কাজল দিয়ে গোল করে দেওয়া 'নজরফোঁটা'। বাচ্চাটি বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষটির কোলে বেশ শান্ত হয়েই বসে আছে। মানুষটির কথা সত্যি— পৃথিবীর সব বাচ্চার মতো এই বাচ্চাটিরও মায়াকাড়া চেহারা।

শারমীন বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, বাচ্চাটি তার হাসিটি খুব একটা বিশ্বাস করল বলে মনে হলো না, এক ধরনের সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে রইল। মানুষটি বাচ্চাটির গাল দুটি টিপে বলল, "এই বাচ্চার জন্য আমার কী অবস্থা আপা আপনি—"

শারমীন মানুষটিকে থামিয়ে বলল, "আমি দেখেছি।"

"আপনি দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ আরেকটু হলে আপনি তো মারা যেতেন—"

"আল্লাহ যদি আমার হায়াত রেখে থাকে তাহলে এত সহজে মরব না আপা।"

শারমীন একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকে— মানুষটি কি সত্যিই বিশ্বাস করে তার জন্ম-মৃত্যু পুরোপুরি আল্লাহর হাতে— তার নিজের কিছুই করার নেই ? ট্রেনের নিচে লাফিয়ে পড়লেও যতদিন তার হায়াত আছে ততদিন কোনো এক অলৌকিক শক্তি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে ? তার কি হায়াত আছে না নেই সেটি কি সে আগে থেকে কখনো জানতে পারবে ?

মানুষটি বাচ্চাটার গাল দুটো একটু টিপে আদর করে বলল, "কলা খাবি মোনা ?"

বাচ্চাটি মাথা নাড়ল, সে খাবে। মানুষটি তার ব্যাগটি বের করে শেষ কলাটি হাতে নিয়ে ছিলকে সরিয়ে বাচ্চাটির হাতে দিল। কলার ওপর অধিকারটি নিশ্চিত করে বাচ্চাটি হাত দিয়ে চার টাকা দামের ক্যাটক্যাটে হলুদ রঙের কেকটি দেখাল, সে কেকটাও খেতে চায়। মানুষটি তার অন্য হাতে কেকের টুকরাটি ধরিয়ে দিয়ে বলল, "খাও মোনা।"

শারমীনের মনে পড়ল একটু আগে সে পকেটমার ছেলেটিকেও একটি কলা এবং কেক দিয়ে এসেছে, কেমন আছে ছেলেটি ? শারমীন জিজ্ঞেস করল, "ওই ছেলেটার কী খবর ?"

"কোন ছেলেটা ?"

"ওই যে স্টেশনে মারছিল—"

"ও পকেটমার ? ওই হারামজাদা ভাগছে, খেয়ে শরীরে জোর হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ভেগে গেছে!"

"কী বললেন ? ভেগে গেছে ? ও তো নড়তেই পারছিল না—"

"আপা আপনি এসব বুঝবেন না। ভান করবে নড়তে পারছে না— আসলে ঠিকই নড়তে পারে। তা ছাড়াও অন্য অনেক রকম ব্যাপার আছে।"

"কী রকম ব্যাপার ?"

"পকেটমারের বড় দল আছে না ? তারা সরায়ে নিছে। আর এইসব পোলাপান বিচ্ছু— এদের জান হলো বিলাইয়ের জানের মতো— মার খেলেও এদের কিছু হয় না।"

শারমীনের ঠিক বিশ্বাস হলো না যে ছেলেটির কিছু হয় নি, শুধু ভান করছিল যে নড়তে পারছে না। তবে যদি সত্যি সরে গিয়ে থাকে তাহলে ভালো, যে

মানুষটার সরে যাওয়ার শক্তি আছে সে হয়তো নিজেকে বাঁচিয়ে ফেলবে। ছেলেটাকে কিছু টাকা দেবে ভেবেছিল আর দেওয়া হলো না। এত অল্প বয়সে ছেলেটির এ রকম ভয়ঙ্কর একটি জীবন, বড় হলে কী হবে কে জানে ?

মানুষটির কোলে বসে থাকা ছোট বাচ্চাটি এক হাতে কলা অন্য হাতে কেকটি ধরে বসে রইল, কিছু মুখে দিল না। হাতে আছে, যখন ইচ্ছে খেতে পারবে— এই বিশ্বাসটিই হয়তো খাওয়া থেকেও আনন্দের।

শারমীন সহযাত্রী মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি ব্যথা পান নি তো ?"

"কী বলেন পাই নাই আপা, ভাবছিলাম পায়ের হাড্ডি বুঝি গেছে। প্যান্টটা গেছে ছিঁড়ে— এই দেখেন—" মানুষটি দেখাল তার সবুজ ভেলভেটের প্যান্টের নিচের দিকে খানিকটা অংশে কালি লাগানো এবং ছেঁড়া।

শারমীন কী বলবে বুঝতে পারল না, একটু ইতস্তত করে বলল, "জানে বেঁচে গিয়েছেন সেটাই বেশি। প্যান্ট না হয় আরেকটা কিনতে পারবেন!"

মানুষটা একটু বিমর্ষ মুখে বলল, "আমার সবচেয়ে ভালো প্যান্টটা গেল। অনেক শখ করে কিনেছিলাম।" ছেঁড়া অংশটা ভালো করে দেখে বলল, "আমার পরিচিত একজন দরজি আছে, খুব ভালো রিপু করে, বোঝাই যায় না। সে মনে হয় ঠিক করে দিতে পারবে।"

শারমীন কী বলবে বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ল। মানুষটির কোলে বসে থাকা ছোট বাচ্চাটির এই জায়গার জন্য কৌতূহল এবং আকর্ষণ শেষ হয়ে গেছে! সে এবারে নাকি সুরে একটু কেঁদে তার চলে যাওয়ার ইচ্ছাটা প্রকাশ করল। মানুষটি বলল, "মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য কাঁদছে।"

"হ্যাঁ। ছোট বাচ্চা, মাকে না দেখে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।"

"মা-বাবা একেবারে গেরাম্যা মানুষ। ট্রেন যে এত বড় জিনিস, কী স্পিডে যায় জানেই না।"

"হ্যাঁ, আপনি না থাকলে ওয়াইফটা আজকে ট্রেনে উঠতেই পারত না।"

মানুষটি শারমীনের কথাটাকে প্রশংসা হিসেবে ধরে নিয়ে খুশিতে দাঁত বের করে হাসল। শারমীন বলল, "আপনি যদি নিচে না নামতেন তাহলে এদের কী হতো ?"

"চা খেতে নেমেছিলাম তাই স্টেশনে ছিলাম। আমার আবার চায়ের নেশা আপা—"

"চা তো দেখি ট্রেনের ভেতরে দেয়।"

"ট্রেনের ভিতরে চা আপা গলাকাটা দাম।"

"ও।" শারমীন কখনো চিন্তা করে নি চায়ের দাম কম বা বেশি হতে পারে এবং একজন সেই চায়ের দাম বাঁচানোর জন্য ট্রেনের ভেতরে চা না খেয়ে স্টেশনে নেমে চা খেতে পারে। একটু আগে পকেটমার ছেলেটাকে বাঁচানোর জন্য সে যখন এক কথায় ব্যাগ থেকে তিনটি পাঁচশ টাকার নোট বের করে দিয়েছে— তখন আশপাশের মানুষগুলো তাকে কী ভেবেছে কে জানে! নিজের অর্থবিত্ত এবং ক্ষমতার জন্য শারমীনের কেমন জানি এক ধরনের সঙ্কোচ হতে থাকে।

বাচ্চাটা আবার নাকি সুরে একটু কেঁদে জানিয়ে দিল, সে এখানে থাকাটা আর পছন্দ করছে না। মানুষটা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "যাই আপা, বাচ্চাটারে দিয়া আসি।"

শারমীন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ট্রেনটি এখন একটা পাহাড়ি এলাকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, দুই পাশে গাছপালা জঙ্গল। মানুষের ভিড়ে সারা দেশের সব বন উজার হয়ে যাচ্ছে— হঠাৎ করে খানিকটা বন দেখে শারমীনের চোখ জুড়িয়ে গেল। সে অন্যমনস্কভাবে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

শারমীন আবিষ্কার করল, সে অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করছে। নিজের দেশকে ছেড়ে চলে গিয়ে সে যেটুকু পেয়েছে এবং যেটুকু হারিয়েছে তার মধ্যে কোনটা বেশি?

অবশ্যি সে পেয়েছে অনেক বেশি। এই বয়সে সে যেখানে পৌঁছেছে সেখানে কি সে পৌঁছাতে পারত এই দেশে থাকলে? পারত না। হয়তো ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হতো। টেনে টুনে এতদিনে সে হয়তো একটা এসোসিয়েট প্রফেসর হতো— কত টাকা বেতন একজন এসোসিয়েট প্রফেসরের? কীভাবে সে এই বেতনে তার সংসার চালাত?

শারমীন একটা নিঃশ্বাস ফেলে— সে নিউইয়র্কে খুব ভালো আছে, দেশের জন্যে মাঝে মাঝে বুকের ভেতরে এক ধরনের নস্টালজিয়া হয়, প্রথম প্রেমের মতো মিষ্টি এক ধরনের অনুভূতি। যদি সে এই দেশে থাকত তাহলে বুকের ভেতরে বিষাদের মতো এই অনুভূতি কি হতো? হতো না। কিছুতেই হতো না।

শুধু একটি ব্যাপার, মাঝে মাঝে বড় একটি সেমিনারের পর যখন দর্শকদের কেউ কেউ তাকে অভিনন্দন জানাতে আসে— এ কথা সে কথার পর যখন তাকে জিজ্ঞেস করে সে কোন দেশের এবং যখন জানতে পারে সে বাংলাদেশের তখন তাদের সেই নিষ্ঠুর বিস্ময়টুকু সে সহ্য করতে পারে না। ওয়াশিংটন ডিসির সেই সিনেটরের কথাটি সে এখনো ভুলতে পারে না, চোখ কপালে তুলে বলল, "তুমি বাংলাদেশের? আমার সাথে ঠাট্টা করছ? ঐ দেশের মানুষের পেটে না এত খিদে যে একজন আরেকজনকে ধরে খেয়ে ফেলে! তোমার মতো একজন সেখান থেকে বের হলো কীভাবে?"

শারমীনের ইচ্ছে করছিল মানুষটির গালে একটি চড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু সে বসায় নি। মানুষটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন সিনেটর— তাদের গালে চড় বসানো যায় না। তাদের কথা হজম করে নিতে হয়।

শারমীন হজম করেছিল। অনেকবার সে হজম করেছে। আরো অনেকবার সে হজম করবে।

বিকেল হয়ে আসছে। শারমীন অনেক দিন পর আজ একটি দিনকে অপরাহ্ণ, বিকেল হয়ে সন্ধের মধ্যে মিশে যেতে দেখবে। প্রতিদিনই ব্যাপারটি ঘটছে কিন্তু সে কখনো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নি। আজকে দেখবে, জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে সে সন্ধ্যাকে নামতে দেখবে। দুলতে দুলতে শব্দ করতে করতে ট্রেনটি ছুটে যাচ্ছে, লাইনের দু'পাশে সুবিস্তৃত ধানক্ষেত, দূরে ছোট ছোট গ্রাম— ক্যামেরায় ছবি তুলে ক্যালেন্ডারের পাতায় দিয়ে দেওয়া যায়! শারমীনের হঠাৎ একটু হাসি পেয়ে যায়— সুন্দর কিছু দেখলেই আজকাল কেন ক্যালেন্ডারের পাতার কথা মনে হয়? এখন কি ক্যালেন্ডারের পাতাটাই খাঁটি? ক্যালেন্ডারের পাতায় স্থান পাওয়ার জন্য প্রকৃতি এ রকম সাজগোজ করে আছে? শারমীন মাথা থেকে চিন্তাটুকু সরিয়ে দিল— কী বাজে একটা ভাবনা!

ট্রেনটা হুইসেল দিয়ে হঠাৎ গতি কমিয়ে আনে। দেখতে দেখতে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে গেল— আরো কয়েকবার হুইসেল দিল। হুইসেলের কোনো ভাষা নেই কিন্তু শারমীনের মনে হয় ট্রেনটি অস্থির হয়ে ডাকাডাকি করছে। শারমীন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনটি ভালো হয়ে যায়। কী চমৎকার নিবিড় একটা গ্রামের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে! মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি, মাটির নিকানো উঠোন। পেছনে ঘন বাঁশঝাড়। সামনে এঁদো ডোবা, তার পাশ দিয়ে মাটির একটা সড়ক চলে গেছে। ট্রেন থেমেছে দেখে ছোট ছোট বাচ্চারা আনন্দে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে— কেউ রুগ্ন নয়, মোটা পেট এবং আনন্দোজ্জ্বল চেহারা। বাচ্চাগুলো ন্যাংটা— গায়ে কোনো কাপড় নেই এবং সেটা নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই! ন্যাংটা শব্দটি বেশ— শারমীন চিন্তা করে দেখল এই বাচ্চাগুলোকে বর্ণনা করার জন্য এই ছোট শব্দটা খুব যুতসই। একজন পাগল যখন গায়ের কাপড় খুলে ফেলে তখন বলতে হয় উলঙ্গ, নগ্ন কথাটার মধ্যে সেক্স সেক্স গন্ধ আছে— যুবতীরা কাপড় খুলে নগ্ন

হয়। কিন্তু ছোট বাচ্চারা যখন কাপড় পরে না তখন ন্যাংটা শব্দটাই ঠিক। শারমীন নিজের মনেই একটু হাসল— শব্দগুলো নিয়ে একটু গবেষণা করলে হয়, কোন সাহিত্যিক কোন শব্দকে কীভাবে ব্যবহার করছেন তার একটা তালিকা থাকলে মন্দ হতো না।

শারমীন গ্রামের দৃশ্যটার দিকে আবার ভালো করে তাকাল। মাটির ঘরের পাশে একটা বউ দাঁড়িয়ে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে আছে— আহা, কী মায়াকাড়া চেহারা! দুজন পুরুষ মানুষ হেঁটে বের হয়ে এলো, ডোবার সামনে দাঁড়িয়ে দুজন কথা বলছে। কথা বলার ভঙ্গি নিস্পৃহ। গ্রামের এই পুরো দৃশ্যটাতে কেমন যেন একটা খুব ধীরগতির ব্যাপার আছে। কোথাও কোনো তাড়াহুড়া নেই, সবকিছু কেমন ধীরস্থির শান্ত। বাসায় ইলেকট্রিসিটি নেই, রেডিও-টেলিভিশন নেই। ভয়ঙ্কর খবর শুনতে হয় না, রক্ত গরম হয় না। বাসায় কম্পিউটার নেই, ই-মেইল নেই। কেউ কাউকে তাগাদা দেয় না। বলতে থাকে না, চল চল আরো জোরে চল, আরো তাড়াতাড়ি চল, সময় নেই— সময় নেই। রাত-বিরাত ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে ওঠে না। শারমীন হঠাৎ করে এই মানুষগুলোর প্রতি এক ধরনের অর্থহীন হিংসা অনুভব করে। এই সুন্দর গ্রামটি যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই থেকে উঠে এসেছে।

ঠিক তখন ব্যাপারটি ঘটল— ডোবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন মানুষের একজন পকেটে হাত দিয়ে একটা মোবাইল টেলিফোন বের করল, কয়েকটা বোতাম চেপে সে কানে লাগায়— কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হঠাৎ করে কথা বলতে শুরু করে। এতদূর থেকে তার কথা শোনা যায় না— কিন্তু ভঙ্গিটি বোঝা যায়, মানুষটি আর নিস্পৃহ নয়, হাত-পা-মুখে তার এক ধরনের উত্তেজনা।

শারমীন কেমন যেন একটা ধাক্কা খেল, মনে হলো কেউ যেন তার আঁকা সুন্দর একটা ছবির মধ্যে একটু কালি ঢেলে দিয়েছে— তার মনে হলো এই সুন্দর নিরিবিলি গ্রামে মোবাইল টেলিফোন দিয়ে কথা বলে খুব অন্যায় করে ফেলেছে! কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যই! নিজেকে সামলে নিল শারমীন— দৃশ্যটি তো খারাপ নয়, দৃশ্যটি ভালো, দৃশ্যটি চমৎকার। সে যেন ট্রেনের ভেতরে বসে থেকে বিভূতিভূষণের গ্রামের দৃশ্য দেখতে পারে এজন্য সব গ্রাম অজপাড়াগাঁ হয়ে বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে থাকবে সেটা তো হতে পারে না। তাকে নতুন দৃশ্যে অভ্যস্ত হতে হবে। ন্যাংটা ছেলে একদিন ইলাস্টিক ব্যান্ড দেওয়া প্যান্ট পরবে। মায়াকাড়া বউটি শাড়ির ওপরে অ্যাপ্রন চড়াবে, বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল

থাকবে, ঘরে ঘরে ডিশ এন্টেনা থাকবে— সেটি হবে নতুন গ্রাম। নতুন বিভূতিভূষণরা সেই নতুন গ্রাম নিয়ে নতুন 'পথের পাঁচালী' লিখবে।

শারমীন হঠাৎ করে একটু হেসে ফেলল। একা একা হাসলে মানুষ পাগল ভাবে, শারমীন তাই হাসতে হাসতে পাশের মানুষটির দিকে তাকাল। মানুষটি অবাক হয়ে বলল, "হাসেন কেন আপা ?"

শারমীন জানালা দিয়ে মোবাইল হাতে মানুষটিকে দেখিয়ে বলল, "ওই মানুষটাকে দেখে।"

সহযাত্রী মানুষটি মোবাইল নিয়ে কথা বলার মধ্যে হাসির কিছু খুঁজে পেল না, ব্যাখ্যার জন্য সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শারমীনের দিকে তাকিয়ে রইল। শারমীন বলল, "এই গ্রামটা দেখে আমি ভেবেছিলাম এর মধ্যে রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন কোনো কিছুর যন্ত্রণা নেই! তার মধ্যে হঠাৎ ফট করে মানুষটা মোবাইল টেলিফোন বের করে ফেলেছে!"

এর মধ্যে কোন অংশটি হাসির, মানুষটি এখনো ধরতে পারে নি। কিন্তু কথার পিঠে ভদ্রতা করে কিছু একটা বলতে হয় তাই বলল, "আপা আজকাল সব মানুষের হাতে মোবাইল— ভাত খাওয়ার পয়সা নাই কিন্তু পকেটে মোবাইল। শালাদের ফোন করার পয়সা নাই তাই মিস কল দেয়।"

ট্রেনের ইঞ্জিনটা পরিতৃপ্তির সুরে একটা লম্বা হুইসেল দিয়ে আবার নড়তে শুরু করে। ছবির মতো গ্রামটা আস্তে আস্তে পেছনে সরে যাচ্ছে। শারমীন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এর আগেরবার যখন দেশে এসেছিলাম তখনো এ রকম হয়েছিল। ভৈরব ফেরি থেকে নৌকার দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ দেখি নৌকাগুলো ছুটছে— ভালো করে তাকিয়ে দেখি সব নৌকার মধ্যে ইঞ্জিন। শ্যালো ইঞ্জিন। প্রথমে খুব মন খারাপ হয়েছিল।"

শারমীন একটু থামল। এখন মানুষটা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে কেন মন খারাপ হয়েছিল ? তখন সে ব্যাপারটা আবার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে। পালতোলা নৌকার সৌন্দর্য, তার আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে এক ধরনের শান্তি— পাশাপাশি শ্যালো ইঞ্জিনের উৎকট শব্দ, ছুটে চলার মধ্যে এক ধরনের নির্লজ্জতা— এই জিনিসগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু মানুষটা কোনো প্রশ্ন না করে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে শারমীনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, "আপা আপনি এই দেশে থাকেন না ?"

শারমীন একটু থতমত খেয়ে গেল, নিজের সম্পর্কে কিছু বলে নি— তাই মানুষটা জানে না যে সে আসলে এ দেশে অল্প কদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। শারমীন ইতস্তত করে বলল, "না— আমি দেশে থাকি না।"

"বেড়াতে এসেছেন ?"

"ঠিক বেড়াতে নয়, কাজে।"

"আবার চলে যাবেন ?"

"হ্যাঁ, চলে যাব।"

শারমীন দেশে থাকে না— এই তথ্যটি জানার প্রতিক্রিয়া হলো মারাত্মক। মানুষটি এক ধরনের বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শারমীনের দিকে তাকিয়ে রইল, যেন শারমীন কোনো মানুষ নয়, যেন একজন দেবী, সশরীরে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। মানুষটি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "তার মানে আপনি লন্ডনি ?"

শারমীন হেসে ফেলল, "না ঠিক লন্ডনি না। আমি নিউইয়র্কে থাকি।"

"নিউইয়র্ক ?" মানুষটা নিঃশ্বাস আটকে বলল, "আমাদের গ্রামের আবদুস সবুর নিউইয়র্কে থাকে। আপনি চেনেন ?"

শারমীন মুখে গাম্ভীর্য ধরে বলল, "আসলে নিউইয়র্ক বিশাল শহর, সারা পৃথিবীর মানুষ থাকে সেখানে। হাজার হাজার বাংলাদেশি থাকে, সবাইকে চেনা খুব মুশকিল।"

মানুষটি কথা বলতে খুব পছন্দ করে এবং এই ট্রেনে বেশিরভাগ সময়ই শারমীন তার কথা শুনে গেছে। মাঝে মাঝে সে বিরক্ত হয় নি তা নয়— কিন্তু সব মিলিয়ে খারাপ লাগে নি। সে যাদের সঙ্গে চলাফেরা করে এই ধরনের একজন মানুষ কখনোই সেখানে আসতে পারবে না। অন্তরঙ্গভাবে কথা বলার কোনো প্রশ্নই আসে না— আজ ট্রেনে হঠাৎ করে এই সুযোগটা এসে গেছে। শারমীন বেশ উপভোগই করেছে। কিন্তু সে আসলে দেশে থাকে না, বিদেশে থাকে এবং সেই বিদেশটি মালয়েশিয়া বা আবুধাবি নয়, বিদেশটি নিউইয়র্ক শুনে মানুষটি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বিদেশ নিয়ে মানুষটির অসম্ভব আগ্রহ, সেখানে মানুষ কেমন করে থাকে, খায়, ঘুমায়, অফিসে যায়, চাকরি করে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল। শারমীন তার পক্ষে যেটুকু সম্ভব এবং এই মানুষটির বুদ্ধিমত্তায় যেটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে সেভাবে উত্তর দিতে থাকে। সেখানকার চাকরি-বাকরির সুযোগ, বেতন,

ভিসা পাওয়ার উপায়— এই ধরনের আলাপ শেষ করে মানুষটি একটু লাজুক মুখে বলল, "আপা আপনারে একটা কথা জিজ্ঞেস করি ? কিছু যদি মনে না নেন—"

শারমীন অনুমান করল, আলাপটি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের প্রেম-ভালোবাসা এবং যৌনতার দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে। সে মাথা নেড়ে বলল, "না, কিছু মনে করব না। জিজ্ঞেস করেন।"

মানুষটি তার হাতটি শারমীনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমেরিকার মেয়েরা নাকি এই রকম গায়ের রঙ খুব পছন্দ করে ?"

শারমীন হেসে ফেলল, বলল, "ছেলে-মেয়ে সবাই রোদে শুয়ে শুয়ে চামড়ার রঙ এ রকম করে ফেলার চেষ্টা করে। মনে হয় একটু পছন্দই করে।"

"এই রকম রঙের পুরুষ মানুষ দেখলেই নাকি মেয়েরা তাদের পিছু নেয় ?"

শারমীন হাসি হাসি মুখে বলল, "না, এগুলো সত্যি নয়। কেউ কারো পিছু নেয় না। সবাই নিজের মতো থাকে। পরিচয় হয়, বন্ধুত্ব হয়, বিয়ে হয়।"

মানুষটি সোজা হয়ে বসে বলল, "কিন্তু আমি শুনেছি এরা বিয়ে না করে এক সঙ্গে থাকে।"

শারমীন কী বলবে বুঝতে পারল না। একটা দেশের একটা সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে নানা ধরনের বৈচিত্র্য আছে, বাহুল্য আছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে, বিদ্রোহ আছে। তার কোনো একটিকে ধরে নিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের হিসেবে ফেলে দেওয়া কি এত সোজা ? তার পরও শারমীন মানুষটাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, মানুষটি অবশ্যি বুঝতে রাজি হলো না। শারমীনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সে অবশ্যি তর্ক শুরু করে দিল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "মসজিদের ইমাম সাহেব বলেছেন এরা হচ্ছে শয়তানের জাতি। এরা পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

শারমীন জিজ্ঞেস করল, "আপনার কী ধারণা ?"

"আমরা অশিক্ষিত মূর্খ মানুষ, আমরা কী বুঝি ?" মানুষটা অপরাধীর মতো একটু হেসে বলল, "আমরা জানি দেশটা টাকা-পয়সার দেশ। তাই সেখানে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করি।"

"কীভাবে চেষ্টা করেন ?"

"প্রত্যেক বছর ডিভির জন্য দরখাস্ত করি।"

ব্যাপারটা কী বুঝতে শারমীনের একটু সময় লাগল। মানুষটা ব্যাখ্যা করার পর বুঝতে পারল, ইমিগ্রেশনের জন্য আবেদন করার একটা গণপদ্ধতি।

মানুষটি হঠাৎ একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "আপা আপনি তো অনেক দিন আমেরিকা আছেন, আমাকে একটা জিনিস বলতে পারবেন ?"

"কী জিনিস ?"

"আমার এখনো বিয়া হয় নাই কিন্তু ডিভির দরখাস্তে আমি লিখেছি আমার বিয়া হয়েছে, এটা কি কোনো ক্ষতি হতে পারে ?"

"কেন লিখেছেন ?"

"যদি ডিভি লেগে যায় তখন বউ নিয়ে যাওয়া যাবে।"

"কিন্তু বউ তো আপনার নেই।"

মানুষটি লাজুক ভঙ্গিতে হেসে বলল, "ডিভি লেগে গেলে বউ কোনো সমস্যা না আপা। মেয়ে দেওয়ার জন্য তখন বাবারা পাগল হয়ে যাবে। কালার টেলিভিশন, মোটরসাইকেল নিয়া হাজির হবে।"

শারমীন ব্যাপারটা এখনো বুঝতে পারছিল না, জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু ফরমে কি আপনার বউয়ের নাম লিখতে হবে না ? ঠিকানা দিতে হবে না ? ছবি দিতে হবে না ?"

"সেটা দিয়ে রেখেছি আপা। আমাদের গ্রামে খুব সোন্দর একটা মেয়ে আছে, পরিবার ভালো, শিক্ষিত পরিবার। এমনিতে আমারে মেয়ে দিবে না। ডিভি লেগে গেলে তখন আর আপত্তি করবে না।"

শারমীন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি যে ওই মেয়েকে নিজের বিয়ে করা বউ বলে ফরমে লিখে রেখেছেন মেয়েটা কি সেটা জানে ?"

মানুষটা অপরাধীর মতো হেসে বলল, "জি না। জানে না।"

শারমীন কী বলবে বুঝতে পারল না। একটু অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটা বলল, "কী মনে হয় আপা, অসুবিধা হবে ?"

"আমি তো এই লাইনের এক্সপার্ট না। তাই বলতে পারব না। তবে মিথ্যা না বলা ভালো।"

মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "সেটা তো সত্যিই বলেছেন। মিথ্যা কথা বললে দোয়া কবুল হয় না। মিথ্যা বলা বড় গুনাহ। কিন্তু আপা, মাঝে-মধ্যে বলতে হয়। মরার আগে একবার তওবা করে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিব।"

শারমীন জিজ্ঞেস করল, "আপনি তওবা করলে আপনার সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে ?"

"জি আপা। আমাদের গ্রামে নজিবর চেয়ারম্যান খুব বড় ডাকাইত ছিল। চুরি, ডাকাতি, খুন জবরদস্তি করে লাখ লাখ টাকা কামাই করেছে। দোতালা বাড়ি, ধানের মেশিন, ট্রলার, বাজারে বড় দোকান, দিনে হাজার টাকা বেচা-কেনা। গত বছর হজ করে আসছে। সব গুনাহ মাফ, এখন দাড়ি রাখছে। টুপি মাথায় দেয়, নামাজ পড়ে। ইহকাল-পরকাল দুইটাই আছে তার।"

শারমীনের খুব কৌতূহল হলো। জিজ্ঞেস করল, "আপনি এর মধ্যে কোনো দোষ দেখেন না ?"

"আগে দোষ ছিল, কিন্তু এখন তো তওবা করে ভালো মানুষ হয়ে গেছে। এখন নাম রেখেছে হাজি নজিবর মোল্লা। এখন আর দোষ কী ?" মানুষটা ভালো মানুষের মতো হাসল।

শারমীন একটু দুশ্চিন্তিত হয়ে বাইরে তাকাল। যদি একজন মানুষ তওবা করে এক সময় সব পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে বিশ্বাস করে অন্যায় করতে শুরু করে, তাকে কি থামানো সম্ভব ?

বাইরে তখন সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। সূর্য ডুবে গেছে, আকাশে লাল আলোর ছটা। গ্রামের পথ ধরে মানুষজন ঘরে ফিরে যাচ্ছে। মাঠে ছেলেপেলেরা ক্রিকেট খেলছে, হাতে বানানো ব্যাট, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি স্ট্যাম্প আর টেনিস বল। আট-নয় বছরের শুকনো কালো একটা মেয়ে পাহাড়ের মতো বিশাল একটা ভয়ঙ্কর-দর্শন ষাঁড়কে অবলীলায় দড়ি ধরে টেনে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের একজন বউ এক পাল হাঁসকে পুকুর থেকে তুলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। কী মায়াকাড়া চেহারা বউটির— হঠাৎ করে শাহেদার কথা মনে পড়ল শারমীনের বহু বছর পর।

নানাবাড়িতে পাশের পাড়ায় শাহেদাদের বাড়ি ছিল, দূর-সম্পর্কের খালা হতো শারমীনের। দুজনের প্রায় এক বয়স ছিল কিন্তু শাহেদা তার থেকে এক ক্লাস ওপরে পড়ত। ছোটবেলা শারমীনের কেমন জানি এক ধরনের প্রতিযোগিতা ছিল শাহেদার সাথে। মনে মনে ভাবত পরের বছর এক ক্লাস ওপরে উঠে সে শাহেদার সমান সমান হয়ে যাবে কিন্তু পরের বছর এসে দেখত শাহেদা আবার এক ক্লাস ওপরে উঠে গেছে। পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল শাহেদা। সেই গ্রামের স্কুল থেকে ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেয়ে গিয়েছিল। একটু বড়

হওয়ার পর শাহেদার সাথে শারমীনের খুব ভাব হয়েছিল। দুজন দুজনের জন্যে সারা বছর অপেক্ষা করে থাকত। শাহেদার সাথে প্রতিযোগিতাটা যখন সে বন্ধ করল তখন একবার এসে দেখল শাহেদা প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে, তার স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে তার বাবা-মা। শাহেদার যে কী সখ ছিল পড়াশোনা করার কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। পরের বছর এসে দেখে তাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে— শারমীন তখন মাত্র ক্লাস টেনে পড়ে। তার সাথে দেখা করতে এসেছিল শাহেদা— ঢলঢলে চেহারা, শাড়ি পরে বড় বড় লাগছে কিন্তু কী বিষণ্ণ চোখ! এতদিন পরে এই বউটিকে দেখে শারমীনের হঠাৎ করে শাহেদার কথা মনে পড়ে গেল। কোথায় আছে এখন শাহেদা ? কেমন আছে ?

ট্রেনের বগির ভেতরে আলো জ্বলে উঠেছে, বই পড়ার জন্য যেটুকু দরকার আলোটা তার থেকে একটু কম। একটু চেষ্টা করলে এই আলোতেই পড়া যায় কিন্তু শারমীনের চেষ্টা করার ইচ্ছে করছে না। হালকা উপন্যাস পড়ার জন্য এই আলো ঠিক আছে কিন্তু পেনরোজের গুরুগম্ভীর পড়ার জন্য আরো আলো দরকার। হিথ্রো থেকে পেপারব্যাক কিনেছে, ছাপাগুলোও ছোট।

শারমীন চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করল। মোহসিন সাহেব বলেছিলেন, তার অনেক কষ্ট হবে, আসলে তার কোনো কষ্টই হয় নি। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঢাকা পৌঁছে যাবে; স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই এক বিশাল বাহিনী এসে হাজির হবে। সবাই মিলে যা একটা বাড়াবাড়ি শুরু করবে, সেটা চিন্তা করে শারমীন এখনই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কে জানে এই মানুষগুলো এর মধ্যেই ট্রেনে উঠে পড়েছে কি না, কে জানে হয়তো এই বগিতেই কেউ একজন দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিংবা কে জানে হয়তো বিশাল গাড়ির বহর নিয়ে ট্রেনের পাশ দিয়ে সবাই ছুটে যাচ্ছে। শারমীন চোখ খুলে তাকাল— না, পাশে ছোট একটা রাস্তায় অন্ধকারে হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা ছোট বাস ধুঁকে ধুঁকে যাচ্ছে, কোনো বিশাল গাড়ির বহর নেই।

শারমীন অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে, দিনের বেলা বাইরে তাকাতেই যে রকম মনটা ভরে উঠেছিল এখন আর সে রকম লাগছে না। অন্ধকার বলে ভালো দেখা যাচ্ছে না, যদি ট্রেনের সব আলো নিভিয়ে দেওয়া যেত তাহলে হয়তো বেশ লাগত। আকাশে ভাঙা মতন একটা চাঁদ আছে ; এই চাঁদের আলোতেই হয়তো সবকিছু অন্যরকম দেখাত। আলো থেকে অন্ধকারে তাকানো যায় না। অন্ধকার দেখতে হয় অন্ধকারে বসে।

শারমীন বগির ভেতরে তাকাল, মানুষগুলো চেহারার মধ্যে এক ধরনের ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। মনে হয় শেষ অংশটুকু আর কারো কাটতে চাইছে না।

বেশিরভাগই চোখ বন্ধ করে বসে আছে। শারমীন পাশে তাকিয়ে দেখল সহযাত্রী মানুষটা সোজা হয়ে বসে আছে। শারমীনের চোখে চোখ পড়তেই বলল, "আপা।"

"কী হলো ?"

"আপনারে আজকে আমি খুব ডিস্টার্ব দিছি।"

"না না, কিছু ডিস্টার্ব করেন নি। আপনার সঙ্গে কথা বলে বেশ সময়টা কেটে গেছে।"

মানুষটা মাথা নাড়ল। বলল, "না আপা। আমি জানি আমি ডিস্টার্ব দিছি।" মানুষটা অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, "আমি খুব বেশি কথা বলি আপা। একবার মুখ খুললে আর মুখ বন্ধ করতে পারি না।"

কথাটিতে সত্যতা আছে, শারমীন তাই হেসে বলল, "কথা বলতে পারা একটা ভালো গুণ।"

"যখন ট্রেনে যাই তখন পয়লাই দেখি পাশে কে বসেছে। রাস্তাটা যদি গপসপ করে যেতে না পারি তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়।"

শারমীন মাথা নাড়ল। বলল, "হতেই পারে।"

"আমরা তো অশিক্ষিত মানুষ, গরিব মানুষ, সবাই কথা বলতে চায় না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে; তখন মনটা আরো বেশি খারাপ হয়।"

শারমীন মানুষটার দিকে তাকাল, সত্যি সত্যি মানুষটার চোখেমুখে এক ধরনের বেদনা। মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "আজকে যখন দেখলাম আপনি পাশে বসেছেন, তখন মনটা খুব খারাপ হলো। ভাবলাম আপনি কি আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন! সারা রাস্তায় কথা বলার মানুষ পাব না। তখন সিট বদলানোর চেষ্টা করেছিলাম।"

শারমীন হেসে বলল, "হ্যাঁ, আমি লক্ষ করেছি।"

"কপালটা ভালো, কেউ রাজি হয় নাই। তাই আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো, কথা হলো।"

শারমীন সহজ ভঙ্গিতে হাসল। মানুষটি বলল, "আপা, আপনার নিউইয়র্কের ঠিকানাটা দেবেন ?"

শারমীন হেসে জিজ্ঞেস করল, "কী করবেন ঠিকানা দিয়ে ?"

"যদি আল্লাহর ইচ্ছায় ডিভি লেগে যায়, নিউইয়র্কে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

"নিশ্চয়ই দেখা করবেন। আপনি একা আসবেন না, আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন।"

"দোয়া করবেন আপা।"

"করব।" শারমীন ভদ্রতা করে বলল, "এতক্ষণ পাশাপাশি বসে আছি আপনার নামটাও জানা হয় নি।"

"আমার নাম—" কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রচণ্ড শব্দ করে ট্রেনটা জানি কোথায় ধাক্কা খেল, সিট থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল শারমীন, শক্ত কোথায় জানি আঘাত খেয়েছে। মুহূর্তে সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, অন্ধকারে ডুবে গেল চারদিক। শারমীন উঠে বসার চেষ্টা করল, পারল না, ট্রেনটা ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ছুটে যাচ্ছে। থামার চেষ্টা করছে কিন্তু থামতে পারছে না। মানুষেরা ভয়ে-আতঙ্কে-যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। তার মধ্যে ট্রেনটা দুলতে দুলতে কাত হয়ে যাচ্ছে— দুমড়ানো ধাতব শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। ট্রেনের এক পাশ থেকে অন্য পাশে গড়িয়ে যাচ্ছে শারমীন, কিছু একটা ধরে নিজেকে থামানোর চেষ্টা করছে কিন্তু থামতে পারছে না। আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল। দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। কিছু একটা আঘাত করল তাকে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে অচেতন হয়ে গেল শারমীন।

হৈচৈ, চিৎকার, চেঁচামেচির মধ্যে জ্ঞান ফিরে পেল শারমীন। কে একজন জানি তাকে ডাকছে, "আপা, চোখ খোলেন আপা। আপা ও আপা।"

শারমীন চোখ খুলল। সে ভেজা কোথায় শুয়ে আছে, ওপরে আকাশ, আকাশে একটা চাঁদ। গাছের ডালে সেই চাঁদের খানিকটা আড়াল হয়ে আছে। সে খোলা আকাশের নিচে গাছের তলায় শুয়ে আছে কেন?

"আপা, ও আপা।"

শারমীন তাকিয়ে দেখে তার মুখের ওপর একজন ঝুঁকে আছে, মানুষটাকে অন্ধকারে চিনতে পারল না। কিন্তু গলার স্বরটা খুব পরিচিত। আগে কোথায় জানি শুনেছে, অনেকবার শুনেছে।

"আর কোনো ভয় নাই আপা, আপনাকে আমি বের করে এনেছি।"

শারমীন চিন্তা করতে পারছে না। তাকে কোথা থেকে বের করে এনেছে? কে বের করে এনেছে? কেন বের করে এনেছে?

"ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল আপা, বগি পড়ে গিয়েছিল।"

শারমীনের হঠাৎ মনে পড়ে যায়। হ্যাঁ, সে ট্রেনে বসেছিল। এই মানুষটার পাশে বসেছিল, মানুষটাকে তার নাম জিজ্ঞেস করেছিল; তখন কী জানি হয়ে গেল, ভয়ঙ্কর একটা শব্দ— অন্ধকারে কোথায় জানি ছিটকে পড়ল সে। ব্যথা ব্যথা, ভয়ঙ্কর ব্যথা। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা!

মানুষটা তার হাত ধরে বলল, "আপা আপনি কোনো ভয় পাবেন না, আমি আছি আপনার সঙ্গে।"

না, সে ভয় পায় নি। সে কখনো ভয় পায় না। তার অনেক সাহস। অনেক তেজ। যখন সে ছোট ছিল তখন সে ভীতু ছিল, এখন সে ভীতু না।

"যখন অ্যাকসিডেন্ট হয় তখন গ্রামের লোকজন ডাকাতি করতে চলে আসে। এজন্য খুব সাবধানে থাকতে হয়। আপনার ব্যাগটাও আমি নিয়ে এসেছি আপা। এই যে আপা আপনার পাশে। কোনো শালা নিতে পারবে না।"

তার ব্যাগ কেউ নিয়ে যাবে ? নিয়ে গেলে কী হবে ? কী আছে ব্যাগে— কিছু টাকা, কিছু কাপড়, কিছু বই-কাগজপত্র হারিয়ে গেলে কী হবে ? কিছু হবে না। কিন্তু হারাবে না— এই মানুষটি নিয়ে এসেছে।

মানুষটা শারমীনের হাত ধরে বসে আছে— এই মানুষটা তাকে বের করে না আনলে তার কী হতো ? কী নাম যেন মানুষটার ? জিজ্ঞেস করা হয় নি।

শারমীন ফিসফিস করে বলল, "এই যে, শোনেন।"

মানুষটা তার কথা শুনল না— হঠাৎ করে মাথা তুলে দাঁড়াল, কিছু একটা দেখে উত্তেজিত হয়ে বলল, "আর ভয় নাই আপা! আর ভয় নাই। পুলিশ চলে এসেছে! একটু পরে ডাক্তার আসবে, অ্যাম্বুলেন্স আসবে, ডাকাত আর সাহস পাবে না আপা!"

শারমীন আবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম কী ? নাম—।"

মানুষটা শুনতে পেল না, সে দাঁড়িয়ে হাত তুলে চিৎকার করতে লাগল, "এদিকে, এদিকে, এদিকে।"

অনেকগুলো পুলিশ ছুটে গেল এদিকে-সেদিকে। কিছু মিলিটারি ছোটাছুটি করছে। টর্চলাইটের উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল হঠাৎ। স্যুট-টাই পরা কিছু মানুষ পাগলের মতো ছুটছে। একজনের হাতে একটা বুল হর্ন— মুখে লাগিয়ে চিৎকার করছে, "ড. শারমীন সিদ্দিকী, ড. শারমীন সিদ্দিকী, আপনি কোথায় ড. শারমীন সিদ্দিকী ?"

মানুষটা পাগলের মতো হাত নাড়ছে, "এই যে এখানে একজন, এখানে একজন। ডাক্তার ডাক্তার।"

স্যুটপরা একজন টর্চলাইটের আলো ফেলে ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ করে আলো এসে পড়ল শারমীনের মুখে, সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষটা চিৎকার করে উঠল, "মাই গড! এইখানে ডক্টর শারমীন।"

মুহূর্তে অসংখ্য মানুষ ঘিরে ফেলল জায়গাটা। মানুষের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল শারমীনের হাত ধরে থাকা সাদাসিধে মানুষটা। একজন ডাক্তার চোখের মণিতে টর্চের আলো ফেলল, হাতের পালস দেখে চিৎকার করে বলল, "শি ইজ অ্যালাইভ! বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন।"

"স্ট্রেচার নিয়ে আস কুইক।"

"কেউ একজন টর্চটা ধর, আমি দেখি ইনজুরি কতটুকু।"

একজন ডাক্তার শারমীনের ওপর ঝুঁকে পড়ে দক্ষ হাতে পরীক্ষা করে বলল, "শি ইজ ওকে। নো মেজর ইনজুরি। ব্লাড লস হয়েছে।"

"কথা বলতে পারেন ?"

"দেখি।" ডাক্তার শারমীনের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "ম্যাডাম, ক্যান ইউ টক ? কথা বলতে পারেন ?"

শারমীন ফিসফিস করে বলল, "পারি।"

ডাক্তার অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কথা বলতে চেষ্টা করছেন— বাট শি ইজ ভেরি উইক। খুব দুর্বল।"

"কী বলছেন ?"

ডাক্তার আবার ঝুঁকে পড়ল, "ইয়েস ম্যাডাম। আপনি কেমন আছেন ? হাউ ডু ইউ ফিল ?"

শারমীন ফিসফিস করে বলল, "ওই মানুষটা কই ?"

"কী বলছেন ম্যাডাম ?"

"ওই যে মানুষটা, তার নাম—"

"নাম ? আমার নাম ? আমি ডক্টর কবির। সিএমএইচের।"

"না না।" শারমীন মাথা নাড়ল, "ওই মানুষটার নাম—"

ডক্টর কবির আরো ঝুঁকে পড়ল, "শুনতে পাচ্ছি না।"

শারমীন ফিসফিস করে বলল, "ওই যে মানুষটা সবুজ ভেলভেটের প্যান্ট—।"

ডক্টর কবির মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "শি ইজ ডেলিরিয়াস। ভুল বকছেন। সবুজ ভেলভেট না কী সব বলছেন।"

শারমীন মাথা নাড়ল, কাতর গলায় বলল, "না! আমি ভুল বকছি না। ওই মানুষটা কই ? সবুজ ভেলভেটের প্যান্টপরা।" কিন্তু তার কথা কেউ শুনল না।

একজন মিলিটারি অফিসার বললেন, "লেটস মুভ। এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। অ্যাম্বুলেন্সে চল।"

"অ্যাম্বুলেন্সটা নিয়ে এস কাছাকাছি।"

"স্ট্রেচার কোথায় ?"

"এই যে এখানে।"

"স্ট্রেচারে তুলতে হবে। আই নিড হেল্প।"

"আছি। আমরা আছি।"

শারমীন টের পেল তার শরীরের নিচে হাত দিয়ে তাকে স্ট্রেচারে তুলছে, টের পেল কেউ চিৎকার করে বলল, "কেয়ারফুল।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে চারজন ওপরে তুলল। বাঁশি বাজাল কেউ। পুলিশ ভিড় ঠেলে জায়গা করে দিল।

"একটা ব্যাগ আছে এখানে?"

"কার ব্যাগ?"

"প্রোব্যাবলি ম্যাডামের।"

"নিয়ে নাও, হারি আপ।"

"অ্যাম্বুলেন্সে গিয়ে একজন ব্লাড রেডি কর। মেক শিওর অ্যাবাউট দ্য গ্রুপ।"

"ওকে স্যার।"

"কর্নেল আকবর।"

"ইয়েস।"

"স্যারকে একটা ফোন করে দেন। বলে দেন এভরিথিং ইজ আন্ডার কন্ট্রোল।"

"ওকে!"

"লেটস মুভ। ডাবল মার্চ।"

শারমীন টের পায় তাকে নিয়ে সবাই ছুটে যাচ্ছে। সামনে-পেছনে মানুষ, ডাক্তার, পুলিশ। সে সাদাসিধে মানুষটাকে আবার খুঁজল, যে মানুষটা তার সবুজ ভেলভেট প্যান্টের মায়া না করে তাকে ট্রেনের ভেতর থেকে টেনে বের করেছে। শারমীন আবার বলল, "এই যে, শোনেন, আপনারা শোনেন, মানুষটার নাম জানা হলো না।"

কেউ তার কথা শুনল না। সবাই মিলে রাস্তার কাছে ছুটে যাচ্ছে। সেখানে দুটো অ্যাম্বুলেন্স। সামনে-পেছনে অসংখ্য গাড়ি। দুই ট্রাক মিলিটারি। এক ট্রাক পুলিশ।

সবুজ ভেলভেটের প্যান্টপরা সাদাসিধে মানুষটা খুব আস্তে আস্তে গাছের নিচে বসল। তারপর সাবধানে গাছে হেলান দিল। হঠাৎ করে তার শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে। চারদিকে মানুষ ছোটাছুটি করছে, একজন আরেকজনকে ডাকছে, চিৎকার করছে, কাঁদছে। অন্ধকারের মধ্যে টর্চলাইটের আলো ছোটাছুটি করছে। কিন্তু মানুষটা এখন কিছুই শুনছে না, কিছুই দেখছে না। সে বড় একটা নিঃশ্বাস নিল, তারপর চোখ বন্ধ করল।

নীল সুতির শাড়ি পরা হালকা-পাতলা আপার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হলো না, সে চেষ্টা করেছিল কিন্তু কাছে যেতেই পারল না। পুলিশ-মিলিটারি আপাকে ঘিরে রেখেছিল। সে বলতে পারল না বাড়িতে গিয়ে সে আপার জন্য দোয়া করবে যেন তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠে। পীর সাহেবের দরগায় টাকা দিয়ে আসবে। ইমাম সাহেবকে বলবে যেন খাস দিলে দোয়া করে।

আপার কাছ থেকে ঠিকানাটাও নেওয়া হলো না। আল্লাহর ইচ্ছায় সে যদি ডিভি পেয়ে যায়, বিলকিস নামের সুন্দর মেয়েটার সঙ্গে যদি বিয়েটা হয়েও যায়, আর দুইজন মিলে যদি নিউইয়র্কে যায়, সে কি আপাকে খুঁজে বের করতে পারবে? সেখানে নাকি লাখ লাখ মানুষ!

মানুষটা ধীরে ধীরে তার পা ছড়িয়ে দেয়। কোথায় জানি খুব ব্যথা করছে, বুঝতে পারছে না। তার সবুজ ভেলভেটের প্যান্টটা ময়লা হচ্ছে। হোক। এমনিতেই রক্তে ভিজে প্যান্টটা মাখামাখি হয়ে গেছে।

তার প্রিয় সবুজ ভেলভেটের প্যান্ট।

—